নীলিমা

উপন্যাস।

কলিকাতা

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯০ সাল।

উপহার।

—:০:—

এই পুস্তকখানি সংপ্রতিপালক আমার মধ্যম সহোদর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল পাল মহাশয়কে এবং প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত পার্ব্বতীনাথ পাল ও শ্রীযুত প্রিয়নাথ দাসকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ সাদরে অর্পিত হইল।

পায়রাশী গ্রাম।
গোপীগঞ্জ পোষ্ট অফিস।
জেলা মেদিনীপুর।

গ্রন্থকার।

নীলিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরবালা না নরবালা ?

সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলে, চন্দ্রপুরবাসিনী নিশা শশীকে (স্বামীকে) শোকপূর্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এবার আমায় জগতে যাইতে হইবে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

শশী। যামিনি ! তুমি আগিয়ে চল, আমি একটু বাদে যাইতেছি।

যামিনী। আপনি তবে কাল যাবেন বলিয়া যাইলেন না কেন ? আজ আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না।

শশী। যামিনি ! ভয় নাই, তুমি যাও, আমি দাদার সঙ্গে দেখা করিয়াই যাইব, কালিকের মত শেষপ্রহরে যাইব না। যামিনি ! তুমি কি আমার অবিশ্বাস কর ?

যামিনী শশীর শেষ কথাটীর উত্তর দিতে অশক্ত। তাঁহার হৃদয়ে শেল বাজিল। আমি তবে যাই বলিয়া যামিনী ভবদেবীর (দূতীর) ঘরে আসিলেন।

নীলিমা।

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, প্রহর হইল, চন্দ্র (স্বামী) আসিল না। রোহিণীকে লইয়া স্বামী রহিল ভাবিয়া যামিনী ক্ষোভে নিশ্চল হইয়া রহিল। সমীরণসহচরী এক এক বার হায় হায় করিয়া দৌড়িতেছিল। এক এক বার শিবাকুল ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তৎশ্রবণে শ্বগণ ক্রোধে গর্জ্জিতেছিল। আকাশবালা তারাগণ চোখ ফুটাইয়া, যামিনীকে দেখিতেছিল। কৃষক, পর্ণকুটীরে বসিয়া গীতের ঝঙ্কার দিতেছিল। বংশীবাদক, বাঁশিতে বিরহসঙ্গীত গাইতেছিল। বিরহিগণ বিরহিণীদিগকে অশ্রুজলে ভাসাইতেছিল।

যামিনীর এই বিষাদের সময় কৃত্রিম খালের উত্তরস্থিত পাকা রাস্তা দিয়া একজন পথিক পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম মুখে যাইতেছিলেন। বিষাদের চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত, ঈষদায়ত সুবঙ্কিম চক্ষু গভীর চিন্তায় গম্ভীর, উন্নত কার্ত্তিকের অনুরূপ ... উদ্বেগশূন্য। রাস্তার উত্তরে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র বিস্তৃত। পথিক ক্ষেত্রের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অধিক দূর যাইতে সক্ষম হইল না। কাছ দিয়া দাঁড়ীরা পূর্ব্বদিকাভিমুখে মাস্তুল-... রজ্জুসংযুক্ত বংশখণ্ড ঘাড়ে দিয়া ঝুকিতে ঝুকিতে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। খাল দিয়া পান্‌শী তীরবৎ জল কাটিয়া ... শব্দে যাইতেছিল। তাহার কর্ণধার নৌকর্ণ ধরিয়া ... পানশীর অগ্রে অগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া পান্‌শী চালাইতেছিল এবং পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রকে ধীরে ধীরে মুখ খুলিতে দেখিয়া—

"তোল হে চাঁদ মামা প্রকুর কর আলো।
নইলে কুমুদী মামী মলো॥

এই গীতটুকু গাহিল এবং দাঁড়ীদিগকে, একটু টেনে টেনে একটু টেনে টেন, কোমরে ঘুমুর বেঁধে দিব বলিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ও কর্ণধারের উৎসাহগীত শুনিয়া, পথিকের ... চিন্তা ক্ষণেক দূর হইয়া গেল। ময়দান অন্ধকার, খালে ... নাই, পথিকের দৃষ্টি নভোমণ্ডলে চলিয়া গেল। তিনি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ক্ষণকাল আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

নীলাকাশে সাত ভেয়ে গয়লাভারি ভাসে।
ভারতপানে চেয়ে কেন তারানিচয় হাসে ?

পথিক মনে মনে ভাবিলেন, তারাগণ যেন তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে—সুখ স্বচ্ছ নাই অন্যে, সুখ শান্ত মন প্রাণে,

না জেনে এ জগজ্জনে, আগুনে যায় সুখের আশে
তাই ত আমরা হাসি ॥

শান্তিসুখে আমরা ভরা, শান্তিবিহীন হোইস্ তোরা,
প্রেম কর না, সুখটী খুঁজ, তাই ত আমরা হাসি ॥
যদি একটী করে উদয় হই, আকাশের কোণায় রই,
উজ্জ্বল করিতাম এত ? কোথা যেতাম মিশি।
ঐক্যতেই এত উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল নভস্তল,
ঐক্যতেই শান্তি গৌরব তোরা নয় প্রয়াসী
তাই ত আমরা হাসি ॥

চলিতে চলিতে পথিকের উত্তরস্থিত ময়দান ফুরাইয়া গেল। তৎপরে ময়দান হইতে উচ্চ সমতল ভদ্রপল্লী। তত্রত্য সারি সারি উচ্চ উচ্চ প্রাসাদের শুভ্রবেশে পথিকের নয়ন মিলিত হইয়া গেল। অতি দূরস্থিত সুখতারা দেখিতে দেখিতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য যেমন চোখে ভাসিতে থাকে, তদ্রূপ উচ্চ উচ্চ সারি সারি প্রাসাদের উপরিতলের কক্ষের বাতায়ন দিয়া আলোক বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া, পথিকের হৃদয় বিমল দাম্পত্যপ্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রভাসিত হইতে লাগিল। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, পথিকের কল্পনাচক্ষে, প্রত্যেক প্রাসাদের উপরিতলের প্রত্যেক কক্ষে (যেথান হইতে আলোক আসিয়া নীচে পড়িতেছে) যেন যুবক যুবতী পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া আছেন। তাঁহারা যেন চোখে চোখে মিশাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের চারি চক্ষু হইতে যেন হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। দুই জনেরই যেন পবিত্র হাসিভরা মুখ। হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহারা

যেন কবিতা, উপন্যাস বলিতেছেন, কখন যেন যুবক বলিতেছেন, যুবতী আহ্লাদে আটখানা হইয়া শুনিতেছেন। কখন যেন যুবতী বলিতেছেন, যুবক সস্নেহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কোন কক্ষে যুবক যেন তবলায় সাহিত করিতেছেন, যুবতী যেন চোখেমুখে হাসি মাখাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, গা দোলাইয়া, অস্ফুট কাকলীস্বরে গাইতেছেন। যুবক এক এক বার যেন সাহিত ছাড়িয়া পবিত্র স্নেহে উন্মত্ত হইয়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। মিল ও টেলরপত্নীর মত কোন কক্ষে যেন শিক্ষিত যুবক শিক্ষিতা যুবতীকে শান্তির অথচ মনুষ্যত্বসাধক উপায় আনন্দহৃদয়ে, গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, শিক্ষিতা যেন উন্নত শান্ত-হৃদয়ে শুনিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। কোন কক্ষে যুবক যেন অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাবতীর অবগুণ্ঠনঘেরা নত মুখখানির অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া, বাম বাহু দিয়া যুবতীর গ্রীবা বেড়িয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তের চারিটী অঙ্গুলি তাঁহার চিবুকতলে লাগাইয়া, সুমধুর সোহাগের হিল্লোল খেলাইতেছেন, লজ্জাবতী যেন মুখ নত করিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছেন, যেন টিপ টিপি হাসি ছড়াইতেছেন, আস্তে আস্তে যুবকের হস্ত সরাইবার জন্য যেন চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন লাজে সঙ্কুচিতা। কোন কক্ষে যেন বিরহিণীর নির্ব্বাক্ রোদন। বাম করতলে কপোল স্থাপিয়া যুবতী যেন ভাবিতেছেন যাঁকে আপন বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তাঁর নিষ্ঠুরতা, তাঁর কটূক্তি ;— যিনি একদিন প্রণয়সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, প্রণয়ের হাসি হাসাইয়াছিলেন, সস্নেহে মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন তিনি আজ ফিরিয়াও চান না, পাগলের মত তাকাইলে, গালি দেন ; কাহাকেও পাঠাইলে তারই কাছে মর্ম্মবেদনাদায়ক গালি দেন ; তিনি এখন সৎ আমি অসতী, ঈশ্বর দণ্ড দিবেন যদি আমি কখন পাপ-চক্ষেকাহারও দিকে চাহিয়া থাকি। যদি সতীত্বরত্ন খুয়াইতাম, তা হলে তাঁহার রাগের ভাজন হইতাম না। বিবেচনা করিয়া

দেখিলে তিনি প্রণয়ের অজ্ঞ, সর্ব্বগুণে বঞ্চিত, তথাচ তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত ঠাকুর বলিয়া ভাবি কেন? তাঁহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইতেছি। ঈশ্বর, হৃদয়রত্নকে দিলেন না। যাঁকে পাইব বলিয়া উন্মত্ত হই, সংসার-রঙ্গশালায় তাঁহাকে লইয়া অভিনয় করিব, না এ জন্মে পাইব না? (অশ্রুবর্ষণ)।

বিরহিণীর এই ভাব ভাবিয়া পথিক বিষণ্ণ, পাপিষ্ঠ নায়ককে বিষচক্ষে দেখিতেছিলেন। বিরহিণী কি চান, পথিকের মনে তর্ক উঠিল। বিরহিণী বলিতেছেন, আমি তাঁহাকে কাছে রাখিতে চাই না, তাঁহার পবিত্র ভালবাসা চাই, প্রেমপূর্ণ পত্র চাই, আশাপত্র লইয়া এই রকম নির্জ্জন নিশীথে আনন্দমনে পড়ি, তাঁর দুঃখে দুঃখিনী সুখে সুখিনী হইয়াছি। এক্ষণে তিনি অশ্রদ্ধা না করিয়া আমাকে দুঃখ সুখের ভাগিনী করেন, এবং স্বয়ং আমার দুঃখের সুখের ভাগী হন, এই চাই।

পথিক গঞ্জে উপস্থিত হইলেন। গঞ্জ নিদ্রিত, পথিককে নিদ্রিত গঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া, দুই একটা কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুরের চীৎকারে এক জন দোকান-দারের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কেও যায়?

পথিক। আমি পথিক, আলিগড় যাইব।

দোকানী। কোথা হইতে আসিতেছ?

পথিক। হুসেনপুর হইতে।

গঞ্জ পার হইয়া এক অশ্বত্থতলে বসিয়া পথিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় ময়দান হইতে একটী গীত আসিয়া পথিকের কর্ণে বাজিল।

রাত পোহালে নলসংক্রান্তি, নল দিব ভাই সবে।
বন্যার ভয় পালিয়ে গেল, ভরসা হোল এবে॥

আনন্দ-হৃদয়-নিঃসৃত গীতে পথিকের বিষাদপূর্ণ হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ময়দানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ময়দানের মধ্যে একটী বৃহৎ বাটী ধপ্ ধপ্ করিতেছে।

সত্বর অশ্বত্থতল হইতে উঠিয়া যে পথ পাকা রাস্তা হইতে ময়দানস্থ পাকা বাটীতে গিয়াছে, সেই পথ দিয়া, পথিক বাটীর কাছে যাইয়া দেখিলেন, মুখ্য বাটীটী দক্ষিণদুয়ারী, তাহার দ্বারে কবাট পড়িয়া গিয়াছে, মুখ্য বাটীটীকে স্পর্শ করিয়া একটী প্রাচীর বরাবর পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীর ধরিয়া যাইতে যাইতে পথিক দেখিলেন, বিশ পঁচিশটা ধানের গোলা প্রাচীরের মধ্যে দণ্ডায়মান এবং পূর্ব্বদিকের প্রাচীর ফুরাইয়া ক্রমে উত্তরে ঘুরিয়াছে। পথিকও ঘুরিলেন, এক বৃহৎ দরজা পাইলেন, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আটচালায় প্রায় তিনশত লোক বসিয়া পাট দিয়া নলের মাথা বাঁধিতে বাঁধিতে গাইতেছে, কড়ীলগ্ন লণ্ঠনগুলি সারি সারি জ্বলিতেছে। গায়কদের গীত বন্ধ হইল। তাহাদের প্রায় ছয় শত চক্ষু আশ্চর্য্যভাবে পথিকের মুখের দিকে পতিত হইল। কেহ ভাবিল, ডিপুটী, খানাতাল্লাসী করিতে আসিযাছেন। কেহ ভাবিল, ক্রিশ্চান্, জাতি মারিতে আসিয়াছে। কেহ ভাবিল, বাবু সাহেব, আমাদের গান শুনিতে আসিযাছেন। একজন বুদ্ধিমান্ ভাবিল, এ আর কেহ নয়, চোর। যিনি আদালতে ফিরেন, তিনি ভাবিলেন, এ ব্যক্তি রোড্‌সেসের কর্ত্তা, আমরা পথে কত লোক চলি দেখিয়া টেক্স ধার্য্য করিবেন। অনেকেরই চম্পট দিবার বাসনা হইল। এই সময়ে একটী লোক পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে?

পথিক। আমি পথিক, আলীগড়ের পথ ভুলিয়া গিয়াছি। তাহা জানিবার জন্য এখানে আমার আসা।

প্রশ্নকারী ব্যক্তি পথিককে বসিবার জন্য একখানা চেয়ার দিল। পথিক তদুপরি বসিয়া প্রাচীরস্থ সারি সারি উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া পশ্চিম দিক্ ভিন্ন তিন দিকের প্রকৃতির শোভা দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। পথিককে মৃদু মৃদু হাসিতে দেখিয়া শেষে সকলে সিদ্ধান্ত করিল, এ ব্যক্তি পাগল। পশ্চিম দিকের আলোকময় দালানে একটী বালিকা দাঁড়াইয়া মুহুরী-

দিগের জমা খরচ দেখিতেছিল। সে পথিককে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে চেয়ারের পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হেঁগা! তুমি এমন করে কি দেখিতেছ? যুবক প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিলেন, আলুলায়িতকেশা হস্তত্রয়পরিমিতা ক্ষীণা সুগোলাঙ্গী শশকনয়না গাঙ্গচীলনাশা ও গাঙ্গচিলভ্রূদ্বয়-ধারিণী যেন একখানি হেমপ্রতিমা। যুবক মস্তক নোয়াইয়া গম্ভীর ভাব ধরিলেন। বালিকা আবার চীৎকার করিয়া বলিল, চিনেছি, তুমি আমার সেই দাদা, তোমার নামে লোকে মন্দ কথা বলে, মা সর্ব্বদা কাঁদেন, এত দিন তুমি কোথা গিয়াছিলে বল না? পথিক কোন উত্তর না দিয়া আরও গম্ভীর ভাব ধরিলেন। মায়ের কাছে চল বলিয়া, বালিকা যুবকের হস্ত ধরিয়া টানিল। যুবক আবেগপূর্ণ চিত্তে কোন কথা না বলিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলের পুতুলের মত প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া বালিকাপ্রদর্শিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া বিদেশস্থ মজুরেরা আশ্চর্য্যান্বিত। ক্ষণ কাল পরে তাহারা বাটী হইতে রোদননিনাদ শুনিতে পাইল, এবং তৎপরে জানিল, পথিক নীলিমার হারাণ দাদা নয়, অবয়বে তাঁহারই অনুরূপ, এই জন্য মা কাঁদিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আনন্দোৎসব।

হেমমালীর স্বর্গীয় পত্নী, ভববাসিনী সপত্নী দিগের নিকট সূর্য্যকে পাঠাইতে অসম্মতা, কিন্তু সূর্য্য জগতে আসিয়া দিনের

সহিত বিহার করিবার জন্য ব্যগ্র। সূর্য্য ও তৎপত্নীর বিতণ্ডা দেখিয়া রসিকা সহচরী উষা হাসি সংবরণ করিতে না পারিয়া উদয়াচলের কবাট খুলিলেন, এবং জগতে বাহির হইয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। উষার হাস্যচ্ছটা দেখিয়া খেচরেরা আহ্লাদে কোলাহল করিয়া উঠিল। নিশান্তে প্রতিদিন যে এক একটী উষা উঠে, তাহাদিগকে কেবল খেচরেরা সম্ভাষণ করে। এই উষা দেবী আশাস্থল নলসংক্রান্তিকে সঙ্গে আনিয়াছেন বলিয়া, কুলাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া ইহাঁকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রত্যেক নরনারী তুলসী-তরুতলে মস্তক রাখিয়া, ইহাঁকে প্রণাম জানাইলেন। অনেকে স্নানান্তে উষার দিকে চাহিয়া স্তবমালা পড়িতে লাগিলেন। কৃষকেরা তুলসীতলে ইহাঁকে প্রণাম করিয়া, নলকে স্কন্ধে তুলিয়া মাঠে চলিল।

এই সময়ে দেবালয়ে বাজনা বাজিতে লাগিল। ভিক্ষুকেরা দেবগৃহের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষার গীত গাইতে লাগিল। সলীলকে সঙ্গে লইয়া নীলিমা প্রাসাদের উপর উঠিলেন এবং দেখিলেন পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শত শত ছাতে শত শত বালিকা, যুবতী, বালক এই শুভ ব্যাপার দেখিতেছে। চপলা যেন ছাতস্থ যুবতীদের দেহে মিশিয়া অচলা হইয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ করিতেছে। আলিসার উপর বক্ষঃ স্থাপিয়া শত শত দেববালা যেন অবস্থিতি করিতেছেন।

এবার নীলিমা ও সলীল পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং দেখিলেন, তিনক্রোশী মাঠে সহস্র সহস্র কৃষক নলের বোঝা কাঁদে করিয়া এ দিক্ ও দিক্ হইতেছে। তাহারা যেন কি বলিতে বলিতে নল পুতিয়া দিতেছে। দুই জন স্থিরমনে এই আনন্দ-কার্য্য দেখিতেছিলেন।

এই সময়ে সলীল দেখিলেন, দুই তিন শত ত্রিতল প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপিত। প্রত্যেক প্রাসাদোপরি ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরীদিগের অঙ্গভঙ্গি, চলনভঙ্গি, কেশের দোলন, শুভ্রবেশ

দেখিয়া তিনি ভাবিলেন,কাল যাহা ভাবিয়াছিলাম,তাহা প্রকৃত। এ ছাতে ও ছাতে আলিসার উপর বুক রাখিয়া শত শত সুন্দরীরা আপন আপন মনের ভাব, কাকলীস্বনে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রুতিতৃপ্তিকর ধ্বনি শুনিয়া সলীল ভাবিলেন, ভারতীর কন্যা না হইলে এমন সুন্দর ভাষা,এমন মধুর কণ্ঠ হইবে কেন? বোধ হয়, ইহাঁরা ভূতলবাসিনী নয়, হরিশ্চন্দ্র রাজার পুণ্যশ্লোকা রমণীগণ হইবেন। ভূতলে যে আগুন লাগিয়াছে, ইহাঁরা সে আগুন কিরকম, তাহা জানেন না। সলীলের চক্ষু হইতে খরতর-বেগে অশ্রু ঝরিল। তিনি হর্ম্ম্যশ্রেণীর দিকে চাহিয়া চিন্তায় নিবিষ্ট, আর নীলিমা সলীলের সেই ঈষতুন্নত সুগোল সুচারু অরুণ-বর্ণ দেহের পানে, সুগঠন মুখের উপযোগী ঈষৎ দীর্ঘ নাসিকার পানে, ঈষদায়ত বঙ্কিম প্রাতর্ভানুবর্ণ উজ্জ্বল চিন্তাপূর্ণ গাম্ভীর্য্য-শালী চক্ষুর পানে, আকর্ণপূরিত কুঞ্চিত ভ্রূ দুই খানির পানে, অপরাহ্নের অর্দ্ধগ্রস্ত ভানুবৎ ললাটের পানে, পক্কবিম্ববর্ণ অধর দুই খানির পানে, নয়নরঞ্জন কর্ণ দুইটীর পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। এবার গঞ্জের দিকে দুই জনে দেখিলেন, রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি প্রথমে ধানের গোলা, চালের গোলা, তার পরে অসংখ্য ইষ্টকের পণ্যশালা; তথায় শত শত দোকানদারের, সহস্র সহস্র ক্রেতার, শত শত কয়ালের, শত শত শকটের, সহস্র সহস্র বোঝাই বলদের, সহস্র সহস্র নরবাহকের শব্দে গভীর গর্জ্জন হইতেছে; বহুসংখ্য প্রাণী পিপীলিকাশ্রেণীর মত যাইতেছে ও আসিতেছে। দুই জনের চক্ষে, এবার সুচারু-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একখানা বৃহৎ শকট পড়িল। শকটের পশ্চাতে লাল পতাকা উড়িতেছিল। পাল্কী গাড়ী খানিকে দুইটা পার্ব্বতীয় গরু টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। দুই জনে এই যানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শকটে।

কার্ত্তিকের প্রথম দিবসের অপরাহ্নে স্বর্গীয় দীপ দিবার জন্য ক্ষুদ্র কৃত্রিম খালের অপর পারের প্রান্তস্থিত শ্রেণীবদ্ধ দৃষ্টিরোধক ইষ্টকনির্ম্মিত একতল দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্ম্যশিখরে দীর্ঘ বংশচূড়ে ফানস ঝুলাইয়া দলে দলে যুবকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ তুলিতেছে। কোন ছাতে বংশ তোলা হইলেই তাহারা দলে দলে ঊর্দ্ধমুখে চাইতে চাইতে ফানসের প্রশংসা করিতে লাগিল। কারটা ভাল, কারটা মন্দ, পরীক্ষা করিবার জন্য তাহারা অন্যান্য ফানসের দিকে চাহিতেছে। এইরূপ তিনশতাধিক ছাতে ফানসসংক্রান্ত ভাল মন্দের তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। হাসির এবং করতালির কোলা-হলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। ছাতে ছাতে দুই একটী বালিকা দুই একটী নবযৌবনা এই আনন্দে মাতিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোল্লি-খিত শিবিকার গোশটকটখানি এ পার দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে-ছিল। আরোহিদ্বয় সাশী খুলিয়া দিয়া অর্দ্ধশয়নাবস্থায় এই আনন্দব্যাপার দেখিতেছিলেন।

খালের ধারে ধারে প্রত্যেক বাটীর সাম্নে সাম্নে এক একটী শাণের ঘাট। শত শত বাটীর শত শত শাণের সারি সারি ঘাটে খাল শোভিত। কোন ঘাটে দুই দশটি যুবতী সুন্দরী স্নান করিতে গিয়া গাত্রমার্জ্জনী দিয়া গা মাজিতেছে। বোউরা চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া ঘোমটা হইতে ঈষৎ মুখ বাহির করিয়া আপন আপন চোখে চোখে মিশাইয়া মিটিমিটি হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে গল্প করিতেছে। তাহারা শকট ও

শকটারোহিদ্বয়কে দেখিয়া, গল্প হাসি বন্ধ করিল। ঝিউড়ীরা ললাট পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া শকট ও শকটারোহিদ্বয়কে দেখিতে লাগিল। শকট চলিয়া গেলে, বোউরা আপন আপন ঘোমটা খুলিয়া দিয়া দেখিতে লাগিল। দুই দশটী সুন্দরী বোউ ঘোমটায় মুখ ঘেরিয়া জলপূর্ণ পীতলের কলসীকে বাহুলতায় বেড়িয়া থম্‌কে থম্‌কে সোপান পার হইয়া, গা দুলাইতে দুলাইতে রূপ ছড়াইতে ছড়াইতে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহারা শকট ও শকটারোহিদ্বয়কে দেখিতে লাগিল। শূন্য কলসীকে বাহুলতায় বেড়িয়া অগ্রে অগ্রে দুই চারি জন যুবতী বোউ, তৎপশ্চাতে দুই চারি জন কনে বোউ ঘোমটা খুলিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যেমন গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোন ঘাটে আসিতেছে, অমনি শকট ও শকটারোহিদ্বয় তাহাদের চক্ষে পড়িলেন। তাহারা ঘোমটা ফেলাইয়া দিল, শকট চলিয়া গেলে আবার ঘোমটা খুলিয়া চত্বরে দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কোন ঘাটে দুই চারিটী কুলাঙ্গনা ভাসমান কলসীর উপর করতল দিয়া অবগুণ্ঠন হইতে উকী মারিতে মারিতে শকট ও শকটারোহিদ্বয়কে দেখিতে লাগিল। পীতলের বারিপূর্ণ কুম্ভকে বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া কতকগুলি কুলাঙ্গনা একটী কুলাঙ্গনাকে বেড়িয়া চত্বরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যস্থিত কুলাঙ্গনা পতির কোন রহস্যকথা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে এবং চতুর্দ্দিকের কুলাঙ্গনারা হাসিয়া হাসিয়া শুনিতেছে। হঠাৎ শকটের দিকে যেমন তাহাদের নজর পড়িল, অমনি কথা বন্ধ হইল, ঘোমটা পড়িয়া গেল। শকট সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, তাহারা পুনরায় ঘোমটা খুলিয়া দেখিতে লাগিল, শকটের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিল।

ছাতের লোকেরা এই মনোরম শকট দেখিতেছিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। প্রত্যেক ছাত হইতে ত্রিশ চল্লিশ হাত ঊর্দ্ধ্বে আনসমব্যস্থ স্বর্গীয় দীপ জ্বলিতে লাগিল। আরোহিদ্বয় গাড়ী

হইতে নামিয়া এক বার দাঁড়াইয়া দৃষ্টি ছড়াইয়া দেখিলেন, যেন সন্ধ্যার সময়ে আকাশের বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রেরা একশ্রেণী হইয়া জ্বলিতেছে; সম্মুখের দুই চারিটী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে ময়ূর, চক্রবাক, খঞ্জন ও অপ্সরোগণ নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছে। এই নক্ষত্রশ্রেণীর দৈর্ঘ্য কত, তাহা তাঁহারা দুই দিকে চাহিয়াও নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না। এবার হর্ম্ম্যশ্রেণী হইতে পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া আরোহিদ্বয়কে জলধির কল্লোল স্মরণ করাইয়া দিলেন আর আনন্দের কল্লোল শ্রবণ করাইলেন। শঙ্খধ্বনি লীন হইয়া গেল। ঢাক, ঢোল, সানাই, খোল, করতাল, ঝাঁঝর, ঘণ্টা দেবালয়ে বাজিয়া উঠিল। ইহাতে আরোহিদ্বয়কে বৈদিক কালে লইয়া গেল। সারি সারি বাটীর সদর দরজা খোলা থাকাতে তাঁহারা দেখিলেন, অনেক যুবতী দীপহস্তে ঘুরিতেছে, অনেক যুবতী ইষ্টকের তুলসীমঞ্চতলে মস্তকাবনত করিয়া রহিয়াছে। বর্গী এলো দেশে, বুলবুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে? এই কবিতার তালে তালে অনেক বালক বাটীর সামনের রাস্তায় নাচিতেছে। দরজার স্তম্ভে হাত দিয়া, অনেক প্রফুল্লাননা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছে। বিস্তৃত পন্থায় যুবকের দল হাতে হাত দিয়া বেড়াইতেছে, গাইতেছে, হাসিতেছে। দলে দলে পথের ধারে ধারে বসিয়া কোথায় গীত, কোথায় গল্প, কোথায় নানা লোকের ভঙ্গি অভিনীত হইতেছে। রাস্তার দিকে যে যে কক্ষ, সেই সব কক্ষের বাতায়ন দিয়া আলোক পথে পড়িয়াছে। আলোকপূর্ণ কোন কক্ষে বালকেরা শব্দ করিয়া পড়িতেছে, কোনটায় খেলার ধুম লাগিয়াছে, কোনটায় মহুরীরা নিঃশব্দে জমা খরচ লিখিতেছে, এবং কোনটা টাকার ঝন্‌ঝনানিতে পরিপূরিত।

যাইতে যাইতে দৃশ্যবস্তু সব ফুরাইয়া গেল। যুবকদ্বয় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। শকট পল্লীশূন্য জনশূন্য রাস্তা দিয়া চলিতে

লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর হইল, কিন্তু তাঁহাদের সামনে একজন লোক কিংবা একটী পল্লী পড়িল না। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে, চালক ও আরোহিদ্বয় অতিদূরস্থ ফাড়ির আলোক দেখিতে পাইলেন। শকটচালক আহ্লাদে চীৎকার করিয়া গান ধরিল :—

এত রাতে, এত রাতে।
কার ঘরের নংরা কুকুর খিড়কীর দুয়ারে।
খিড়কীর দর খোলা আছে, ঢুক্‌লে মারবো ঝা টা,
খোকার বাপ জেগে আছে এত বুকের পাটা ?
এত রাতে, এত রাতে।
টপর টপর জল পড়ে ভিজে মরিস্ কেন ?
মানতলা তুই ভুলে গেছিস্ মনে করি যেন,
টো, টো, হু, হু, হু।
যে গাঁয়ে পিরীতের কুচল কাণেতে মোর যাবে রে ?
বড়াই বুড়ো নাম ধরি, বিন্দাবনে বাস করি,
রাধার প্রেমে নবদ্বীপে, গোউর হয়েছো।
গোউর হয়েছো, তুমি কপ্‌নি পরেছো।
এত রাতে কার ঘরের নংরা কুকুর খিড়কীব দুয়ারে।

চালকের গীত থামিয়া গেল। অদ্ধশয়নাবস্থায় একজন আরোহী শোকপূর্ণ কণ্ঠে গীত ধরিলেন :—

প্রণয়-প্রতিমা আমার প্রিয়তমা, কোথায় আছো গো ?
হারায়ে প্রাণ তোমা প্রাণে,———

আর গাইতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া অন্য আরোহী বলিলেন, ভাই অনীল! অধৈর্য্য যাহা হৃদয়ের জিনিষ নয়, তাহাতে রত হও কেন ? অনীল শোকপূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, প্রসূন ! প্রেম মানবের প্রাণ। প্রেমনির্ম্মিত প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অন্য প্রাণকে আনিয়া আপনার সহিত যোজনা করিয়া আপনার আয়তন বৃদ্ধি করা। সে যে প্রাণকে লইয়া স্বীয়

আয়তন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পায়, তাহাকে না পাইলে, আপনা হইতে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। যেমন লতা তরুর সহিত জড়াইতে না পারিলে, আপনা হইতে পড়িয়া যায়। লতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, গাছের সহিত জড়ান। প্রেমনির্ম্মিত প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অন্য প্রাণের সহিত মিলিত হওয়া। গাছ না বেড়িতে পারিলে লতা যেমন বিলীন হয়, তেমনি প্রেমনির্ম্মিত প্রাণ অন্য প্রাণে মিলিত হইতে না পারিলে ধ্বংস হয়। ভাই! এইপ্রকার অধৈর্য্য যাহা স্বভাবজাত নিয়মে থাকিলেও উপস্থিত হয়, তাহাকে দুষ কি প্রকারে? আমি ত কুসংস্কারের কিংবা অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অধৈর্য্য হই নাই?

প্রশ্ন। কুসংস্কারের কিংবা অজ্ঞানের বশীভূত না হইলে কেহ কখন অধৈর্য্য হয় না। মূর্খেরা সম্পূর্ণ মূর্খ নয়, কারণ তাহারা এক একটা প্রাণ যোগ করিয়াছে। অল্পজ্ঞানীরা এক একটী রমণীর সহিত প্রমোদ করে। পৃথিবীতে অল্পজ্ঞানীদের দল অধিকাংশ। অল্পজ্ঞানীদের সেই আমোদ দেখিয়া শুনিয়া তুমিও একটী রমণীর সহিত মিলিত হইয়া, আমোদ করিতে কামনা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া অধৈর্য্য হইয়াছ। সুন্দরীর সহিত আপন প্রাণকে যোগ করিতে হইবে, সুন্দরীর সহিত কেবল একমাত্র আমোদ প্রমোদ, এবং সুন্দরীর সহিত প্রণয় না করিলে সুখ নাই, এ জ্ঞান তোমার কোথা হইতে আসিল? বাল্যকালে তোমার এ আশা ছিল না কেন? ভাই অনীল! এই জ্ঞান তোমার অল্পজ্ঞানিবর্গ হইতে আসিয়াছে, এবং অমার্জ্জিত আত্মা হইতে তোমার মনে উক্ত সংস্কার জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি অধৈর্য্য হইয়াছ। যদি সত্য জ্ঞান পাইতে, সত্য জ্ঞান কি? যে প্রাণপূর্ণ জগৎ, সকল প্রাণের সহিত যোগ করিলে প্রাণ হিমালয় হয়, সকল প্রাণ এক, যদি একজন মরিত, আর একজন জন্মিয়া তাহার স্থান পূরণ করিয়া দিত এবং যদি এই সত্য বিশ্বাস করিতে আত্মার ধ্বংস

নাই, যে আত্মাকে মরিতে দেখি, এক ঘটী জল নদীতে ঢালিলে যেমন সমস্ত সমুদ্রে মিশিতে পারে, সেই রকম সেই আত্মা একটা শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া সকল শরীরে মিশে, তাহা হইলে তুমি অধৈর্য্য বলিয়া জানিতে না। শেষ কথা, তুমি অমার্জ্জিত আত্মাগুলি হইতে সংস্কার পাইয়া অধৈর্য্য হইয়াছ, আর কিছু নয়। সত্য জ্ঞানের অর্থাৎ মনের অনুকূল জ্ঞানের সেবা করিলে অধৈর্য্য হইতে না। আর এক কথা বলি, সুন্দরী মেয়েগুলার রং আগুন, তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, কথা কহিলে দুঃখে পড়িতে হয়; এই কথা যদি সকলের মুখে শুনিতে ও সকলকে যদি এই কথানুযায়ী কাজ করিতে দেখিতে, তাহা হইলে তুমি যে জ্ঞান পাইয়া অধৈর্য্য হইয়াছ, তাহা পাইতে না। ভাই! বারে বারে বলিতেছি, সত্যজ্ঞানে অধৈর্য্য নাই। কুসংস্কার ও অজ্ঞান হইতে অধৈর্য্য জন্মে।

অনীল। তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহা প্রতিদিন লোককে করিতে দেখা যায়, তাহা মিথ্যা হইলেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও জ্ঞানবিরুদ্ধ হইলেও, ক্রমে ক্রমে সংস্কার জন্মিয়া আপনার হৃদয় বলিয়া বোধ হয়। সেই কাজ করিতে যেন সে জগতে আসে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, গোহাদক, সুরাপায়ী, কামুক। ভাই! আমি তোমার কথিত জ্ঞান শিক্ষা করি নাই। শিশুকালে শিশুদের সহিত প্রণয় করিয়াছিলাম, তাহারা যে ব্যবহার করিয়াছিল আমিও তাহা আনন্দের সহিত করিয়াছিলাম। এখন আমি যুবক, তোমা ভিন্ন প্রায় সমস্ত যুবককে রমণীর সহিত প্রেম করিতে দেখিতেছি, আমাকেও তাহাদের দলে মিশাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। ভাই! বলিব কি? তোমার কথা সত্য জানিয়াও আমি অবিশ্বাস করি, নিজে জানিতে পারিয়াও, আমি মিথ্যা জানিয়াছি বোধ করি। যুবকদলকে আনন্দে খেলিতে দেখিয়া যাইতেছি।

প্রসূন। অনীল! তুমি যেখানে স্বয়ং দেখিয়া যাইতেছ না, সেখানে যুবকেরা তোমার মনের উপর চড়িয়া ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তা তুমি জানিতে পারিতেছ না কি? যেমন ছয় জন কর্ণধার এক নদী দিয়া যাইতেছে। একটা খাল দেখিয়া তন্মধ্যে পাঁচ জন প্রবেশ করিল, আর এক জন মাজীকে কিছুই বলিল না। যে মাজী যাইল না সে ঐ খাল দিয়া কখন যায় নাই বটে, কিন্তু ঐ খালে যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে দস্যুকর্তৃক মারা পড়িয়াছে; এই কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছিল। সে পান্‌শী তীরে লাগাইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় অনেক মাজী অনেক নৌকা লইয়া আবার ঐ খালে প্রবিষ্ট হইল। সকলকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, তাহার সত্য বিশ্বাস টলিল। তৎপরে সেও খালে পান্‌শী প্রবেশ করাইল, এবং মরিল। উক্ত মাজীর মত তোমার দশা ঘটিয়াছে। জ্ঞানী মাজীকে প্রকাশ্যে না ডাকিয়া, যেমন প্রবেশ এই কার্য্য দ্বারা ডাকিয়া অজ্ঞান করিয়া লইয়া গেল, তেমনি তোমাকে যুবকেরা প্রকাশ্যে না ডাকিয়া কার্য্য দ্বারা ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না? অন্ধ হইয়া যাইও না অনীল! ভাই! ভাল করিয়া স্থির হইয়া দেখ দেখি, যে আশায় তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, তাহা তোমার মনের উপর রহিয়াছে কি না? এবং তোমার ঐ আশা যে তোমার মন হইতে পৃথক্, তাহা স্থির হইয়া মনশ্চক্ষু দ্বারা দেখ। এই আশাকে তুমি তাড়াইলে তাড়াইতে পার, কারণ ইহা অজ্ঞ লোকের অপবিত্র কথা ও কার্য্যগুলি এবং মনের বিরুদ্ধ-চারিণী। ভাই! আপনাকে আপনি দমন করিতে পার না, পরকেই পার, তজ্জন্য ঐরূপ আশাকে দমন করিতে পার। মনে কর, তুমি নির্দ্দোষ যুবক, সংসারের কি সুখ এখন কিছুই জান না এবং কাহারও মুখে কখন কোন অপবিত্র কথা শুন নাই, এমন অবস্থায় তুমি যদি চার্ব্বাকের, ভারতচন্দ্রের,

কামিনীকুমারের অপবিত্র সুখের কথাগুলি পড়, তাহা হইলে তোমার মনে কি আশা জন্মিবে না? নিশ্চয় জন্মিবে। এই আশা তোমার মনের উপর রহিয়া তোমাকে চঞ্চল করিবে, কিন্তু তোমার মনের সহিত মিশিবে না। আবার যদি তুমি নাস্তিক কমটের পবিত্র কথা শুন, তাহা হইলে তাহা তোমার মনের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং তাহাতে তোমার মন শান্ত হইবে। তাই বলি, পরই মনকে চঞ্চল করে, এবং পরকেই মন হইতে দূরীভূত করিতে পার। চার্ব্বাকের কথাগুলি মন হইতে দূরীভূত করিতে পার, কিন্তু কমটের কথাগুলিকে মন হইতে তাড়াইতে পার না। কারণ কমটের কথা অমার্জ্জিত আত্মার কথা নয়, পবিত্র আত্মার কথা। তুমি নির্দ্দোষ বলিয়া কমটের নির্ম্মল আত্মা হইতে উদ্ভূত নির্ম্মল কথাগুলি তোমায় মিলিত হইল। কারণ জলে জল মিশে। কমটে আর তোমায় মিলিত হওয়ায় এই জানা গেল, যে কমটে আর তোমায় এক। যে আশাকে তুমি তাড়াইতে সক্ষম, যাহা আত্মার বিরুদ্ধ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, যে আশাতে আত্মার শুরুত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না এবং ক্রমে ক্রমে আত্মাকে নাশ করে, তুমি তাহার কুহকে যাইও না।

অনীল প্রসূনের কথা শুনিয়া হাসিয়া গম্ভীর ভাব ধরিয়া ভাবিলেন, আমি কেন হাসিলাম? প্রসূনকে পাগল ভাবিয়া? কে পাগল? ক্ষণেক চিন্তিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, প্রসূন! তুমি আমার দেব। তোমার কথা অমূল্য। আমি তোমার কথায় চলিব। ইহা বলিয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আবার হাসিয়া উঠিলেন এবং প্রসূনকে সামান্য চক্ষে দেখিলেন।

তাহা দেখিয়া প্রসূন গম্ভীরভাবে বলিলেন, অনীল! তোমার আত্মাকে নাস্তীর ন্যায় দেখিতে পাই। নতুবা তুমি এই গাত্র ধৌত করিলে, আবার ধূলা মাখিলে কেন? ভাই! তোমার সুখ

তোমাতে নাই, একটা মেয়ের কাছে আছে। সে তোমাকে সুখ দিবে তবে তুমি সুখী হইবে, এ যে পাগলের চিন্তা। তার কাছে সুখ আছে বলিয়া, তুমি কি করিয়া জানিলে? সুখে কি তার হৃদয় বর্ষার নদীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়াছ? সেও ত তোমার কাছে সুখ আছে বলিয়া, পাগলিনী। তার পাগলামি দেখিয়া, তাহার পিতা কি জানি কোন দেশে অজ্ঞাতসারে পাঠাইল। ভাই! কাহাকে কেহ সুখ দিতে পারে না। সুখ প্রণয়নির্ম্মিত স্বাধীন জীবনে। সে যদি তোমাকে না ভাল বাসিল, তুমি কেমন করিয়া তাহাকে ভাল বাসাইবে? তোমাকে সে ভাল বাসিবে, এই প্রত্যাশায় যাইতেছ? ভাই! এ অমূলক আশা ছাড়। যাহা তোমার আত্মায় নাই, যাহা তোমার শক্তির বহির্ভূত, এমন চিন্তা করিও না। অনীল! তোমার প্রায় লক্ষ লক্ষ প্রজা আছে। তাহারা তোমাকে ঈশ্বরের মত ভক্তি করে, তাহাদিগকেও তুমি আপনার আত্মার মত ভাল বাসিতে। তোমার পিতা মাতা আছেন, আমার মত শত শত বান্ধব আছেন, শত শত দাস দাসী আছে। এত লোকের ভালবাসা ছাড়িয়া, তুমি এক জন মেয়ের ভালবাসা ক্রয় করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়াছ। ভাই! এমন পাগলামী করিও না, মন হইতে এ আশা দূরীভূত কর। তুমি, তোমার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, তোমার পিতার কোটী কোটী টাকার জমিদারী কে রাখিবে ভাই? ক্ষিপ্ত হইও না। তুমি তাহাকে পাঁচ বৎসর অনবরত খুজিতেছ। আমি তোমার সঙ্গ ধরিয়া আজি পাঁচ বৎসর তোমাকে বুঝাইতেছি, তথাচ বুঝিলে না?

এমন সময়ে গাড়োয়ান গীত ধরিল :—

রাত ঠাকুরাণ! সারা রাতটা খুজি তোমারে,
আমি অনেক ডেকেছি,
তোমার সাড়াও শুনেছি,

আগুনের গর্ত্তেতে শেষে, পুড়ে মরেছি ; টো টো।
প্রাণে সারা, সারা রাতটা পর-কথায় পোড়ে,
প্রাণে পুড়ে মরেছি।
সে আগুনে পুড়ে মরে, ঠকে শিখেছি ; হুঁ হুঁ হুঁ।
মাথার ভিতর বোসে তুমি হাসি দেও ছেড়ে
আমি জেনেছি এবার।
মাথায় থেকে হেসে কয়ে, মার লো বাহার॥

প্রসূননামক আরোহী প্রকৃতানন্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, বলিহারী গাড়োয়ান!

গাড়োয়ান আনন্দে—
চোখ ঘুরায়ে, ঠোঁট বাঁকায়ে, মুখ নাচায়ে কও,
কথা মাথা থেকে কও।
মাথার ভিতর খেমটা নেচে, চটক লাগাও,
আমায় আটকে রেখে দেও॥
সিয়ান যে জন, এক বার ঠকে, দুবার না হাবে,
প্রাণ ছাড়বনাক আর।
আয় রে মোর তুলসীমালা, গলে দুল্ আমার॥
পেঁক, যা যা যা।
চোখ পথ দিয়ে যেয়ে আমি ধল্লাম্ জড়ায়ে,
আমায় দেও লো রতি দান।
জীবের ভিতর জীব রেখে দেও জড়িয়ে করি পান॥

গাড়োয়ানের এই গীত অনীলনামক আরোহীর কর্ণে স্থান পাইল না। প্রসূন বলিলেন, অনীল! তুমি কি নিতান্ত ক্ষেপিযাছ? গাড়োয়ানের আনন্দ হৃদয়ের গীতে কি তোমার আনন্দ হইল না?

অনীল। নীহারের জন্য কাঁদিয়া যে সুখ, তাহা গায়কের গীতে নাই।

প্রসূন। এ বিচ্ছেদের কাঁদা, কল্পিত স্বার্থ পূরিল না

বলিয়া কাঁদা। এই কাঁদায় দেহের রক্ত জল হইয়া বাহির হয়। বিপদ্‌গ্রস্তার বিপদ্ দেখিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে যে কাঁদা তাহাই সুখের কাঁদা। সে কাঁদায় শক্তি বৃদ্ধি করে, উৎসাহ বৃদ্ধি করে, আয়ু-র্ব্বৃদ্ধি করে, প্রাণ যাতে রক্ষা হয়, তাহার উপায় করে। ভাই! তুমি প্রাণনাশক কাঁদা কাঁদিও না।

অনীল। আমি তবে এ কাঁদায় সুখ পাইতেছি কেন?

প্রসূন। হাঁ, অনন্ত বহ্নিশিখাগর্ভস্থ কামুক অপেক্ষা তুমি সহস্রাংশে সুখী। কারণ তোমার প্রেমনির্ম্মিত প্রাণ পরকথার আশায় মোহিত হইয়াও একটা প্রাণকে লইতে চেষ্টা করিতেছে। তোমার প্রাণ প্রেমমিশ্রিত আছে বলিয়া তুমি কামুক অপেক্ষা কোটী গুণে সুখী; কিন্তু বিশ্বপ্রেমিকের কাছে ঘোর নরকে পড়িয়া রহিয়াছ। যেখানে তুমি পরের কথায় তিনভাগ বশ হইয়া পড়িয়াছ, সেখানে কালে যে সম্পূর্ণ বশ হইয়া ঘোর নারকী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনীল। প্রসূন! তুমি আমায় এমন ঘৃণিত কথা বল? এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রসূন। ভাই! রাগ করিও না। নীহারের সঙ্গে কেবল প্রাণের যোজনা করিয়া যদি প্রেমিক হইয়া থাকিতে চাও, তবে তাহার সহবাসের ইচ্ছা করিও না। এখন তোমার হৃদয়ে যে প্রেমটুকু আছে, যে সুখটুকু আছে, তাহাকে যদি ঢাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে সহবাসের ইচ্ছা করিও না। সহবাসে থাকিলে আপনাতে আপনি থাকিবে না। নীহারের প্রেমপূর্ণ লিপি তোমার আছে ত? তবে নীহার তোমার কাছে যে। তবে তার অন্বেষণে প্রয়োজন কি? অপমানের ভয়ে নীহারের পিতা নীহারকে যথায় লুকাইয়াছেন, তুমি তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবে না। শুন, বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকের সহবাসের সুবিধা থাকিলেও অনন্ত দোষ। সহবাসে ক্রমে ক্রমে দেবী নারকী ও অসহবাসে প্রণয়িনী দেবী হইয়া যান। যাকে পাইবে না,

পাইলে অমঙ্গল; কারণ এক জনকে ভাল বাসিলে, এক কোটি লোকের ভালবাসা খুয়াইতে হয়। যাহাতে অকীর্ত্তি হয়, সমাজ ছাড়া হইতে হয়, কুসংস্কারের বশীভূত হইতে হয়, মূর্খ হইতে হয়, সে কার্য্যের আশা ছাড়। আমার স্মরণ হয়, কে এক জন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, সক্রেতিস্ হইয়া চির কাল অসুখী হই, সেও ভাল, তথাপি অসভ্য ও মূর্খ হইয়া সুখী হইব না।

এই সময়ে শকট ফাঁড়ী পার হইয়া চলিয়া গেল। গাড়োয়ান এক বার গ্রীবা বাঁকাইয়া পশ্চাৎ ভাগে চাহিল। ফাড়ীর প্রহরীর আলোক ধক্ ধক্ করিয়া তাহার চোখে লাগিল। সে মুখ ফিরাইবামাত্র শুনিল বোউ কথা কও, বোউ কথা কও।

প্রসূন তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

প্রবাসী যুবক বসে প্রবাহিণীপুলিনে,
ডেকে ডেকে যায় পাখী, বোউ কথা কও।
চমকে বিরহী যুবা, পূর্ব্বভাব স্মরণে,
মানিনীরে সেধেছিল, বোউ কথা কও ॥

ম্লানমুখী বিরহিণী রসালতলাতে,
শাখিপরে ডাকে পাখী বোউ কথা কও।
স্মরিয়া পূর্ব্বের মান লাগিল ঝুরিতে,
সেধেছিল প্রিয় জন, বোউ কথা কও ॥

ম্লানাননা, নবীনা, শয়নপর বসিয়া,
যুবক চাহিয়া আছে ম্লান ইন্দু পানে,
ভাঙ্গাবার তরে মান দুটী করে ধরিয়া
সাধিতেছে যুবা জন, বোউ কথা কও ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই জনের দুই ভাব।

নদীর পূর্ব্বপারস্থিত একখানি ইষ্টকের ত্রিতল বাটী শুভ্র-বেশে তীরে ধপ ধপ্ করিতেছে। ঐ বাটীর ছাতের উপর থেকে দৃষ্টিপ্রসারণ করিলে চক্ষে অন্য বাটী পড়ে না। প্রাচীরমধ্যস্থ বাটীর চতুর্দ্দিকে পরিমিত ফুলের বাগান। বাটীখানি দক্ষিণ-দ্বারী। পশ্চিমে অতি দূরে গিরিশ্রেণী, পশ্চাৎ ভাগে পূর্ব্বদিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, শস্যক্ষেত্র। কার্ত্তিকের অপরাহ্নে ঐ বাটীর ছাতের উপর দুইটী শুভ্রবেশা মহিলা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মানা। তাঁহাদিগের দৃষ্টির কোন প্রতিবন্ধক নাই। দৃষ্টি-তলে কোটী কোটী হরিতের ঢেউ খেলিতেছে দেখিয়া একটী রমণী বলিয়া উঠিলেন :—

হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, রূপসাগরে খেলে,
পবন রূপসাগরে খেলে।
সবুজদিদী পতির কোলে, হেলে দুলে চলে,
সবুজ হেলে দুলে চলে॥

যৌনবতীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল। শ্লোকপ্রকাশিনী যৌন-বতীর হস্ত ধরিয়া উত্তরদিকের আলিসার উপর বক্ষ রাখিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টিতলে রাস্তার পার্শ্বে পোতা ঝাউ, কদম্ব এবং বাদামগাছের শ্রেণী ঈষৎ দুলিতেছিল। আর পরপারের রাস্তায় যাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যুবতীদ্বয়

সেখান হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকের আলিসার উপর বক্ষঃ দিয়া জুয়ারপূর্ণ নদীহৃদয়ে চাহিয়া রহিলেন।

শ্লোকপ্রকাশিনী হাসিয়া হাসিয়া গা নাচাইতে নাচাইতে বাক্‌হীনার মুখের পানে চাইয়া বলিলেন:—

জুয়ার কেন হয় বলি শুন্‌
জুয়ার কেন হয়।
পুরুষের ভালবাসার দিবার পরিচয়
জুয়ার তাই ত দিন্‌ দিন্‌ হয়॥
অধিক ক্ষণ জুয়ার কেন রহেনাক কাছে?
এর নিগূঢ় কথা আছে।
গম্ভীর প্রেমিকৃকে লোক হাল্‌কা বলে পাছে।
জুয়ার তাই থাকে না কাছে॥

কি ভাবিয়া ম্লানাননার মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। রসিকা গলগল ফুটাইয়া মৌনবতীর দিকে চাইয়া বলিলেন:—

কবি যারে, রতি করে,
রুধ্‌বে কে তার গতি?
ওলো! রুধ্‌বে কে তার গতি?
হেলে দুলে বেগে চলে
সাগরের বেগবতী,
ওলো! সাগরের বেগবতী॥
কুসমাজ পায় লাজ
উন্নতচেতার কাছে;
ওলো! স্বাধীনমনার কাছে।
ভালবাসার জোরের কাছে
অন্য জোর কি আছে?
ওলো! অন্য জোর কি আছে?

সহচরী প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইলেন। রসিকা হাসিলেন, তাহা পর মৌনবতী স্বকৃত শ্লোক গম্ভীরভাবে বলিলেন:—

কেমন ধারা বলা তুই লো!
কেমন ধারা বলা।
অবলা যে নাম দিয়েছে
তোর কাছে তার বলা॥
ছলা ছিঁড়ে প্রাণটীরে যায়,
কেবল কি তোর ছলা।
ছলা ছেড়ে প্রাণটীয়ে যায়,
এখন কি তোর ছলা॥
ভুটায় বাজে ভুটা অতীত
ভুটা কথা তোর শুনে।
জীবন অতীত গেল আমার,
জীবন অতিথ বিনে॥
জীবন রহিত, জীবন রোহিত,
হয় যে লো! উতলা।
গো বিনে গোপাল যেমন
বিনে গো গোপালা।

পরপারের রাস্তা দিয়া একখানি শকটকে যাইতে দেখিয়া দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। শকট হইতে কে গাইতেছে—

না হতে পাঁচ ঘড়ী বেলা, পরাণভানু পঙ্কজ পায়।
পতিত জীবন আমার, পতিতবন্ধু রইলে কোথায়?
জ্ঞান, প্রেম, সত্য, শান্তি, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, হৃদে এসো।
বোস, ক্লেশ নাশ শিব! অশিবতে পরাণ যায়॥

গায়কের চোখে ছাতস্থ দুইটী রমণী পড়িয়া গেলেন। একটী ঈষদুন্নতা, সুঠামা সুগোলা লক্ষ্মীমুখা লক্ষ্মীকায়া লক্ষ্মীবর্ণা দীর্ঘচামরকেশা নীলাম্বরবসনা। তাঁহার যৌবনসলিলে বপুনদী ফাটিয়া পড়িতেছে। অপরটী উজ্জ্বলশ্যামা ঈষৎস্থূলা মধ্যমকায়া পদ্মফুল্লগম্ভীরবদনা মুক্তকেশী। তাঁহার পরিধানে নীলাম্বর। গায়কের বড় বড় বঙ্কিম বিষাদযুক্ত চক্ষু লক্ষ্মীবর্ণার চক্ষুতে

মিশিয়া কথা কহিতে লাগিল। আবার লক্ষ্মীকায়ার চক্ষু গায়কের চক্ষু হইতে নামিয়া, তাঁহার তেজঃপুঞ্জ স্থূল উন্নত কায়ের পানে চাহিল। তিনি অনীলকে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অনীল আনন্দে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। উজ্জ্বলশ্যামা গায়ককে দেখিয়া উজ্জ্বল চক্ষু হাসাইয়া পলাইয়া গেলেন। গায়ক তাঁহাকে দেখিলেন না। অগ্রস্থিত চটীতে প্রস্থান চলিয়া গিয়াছিলেন। উল্লিখিত বাটী হইতে একজন চতুরা বৃদ্ধা আসিয়া অনীলের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। অনীল শকটবাহককে শকট সরাইতে লইয়া যাইবার হুকুম করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে পশ্চিমদিকে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা চকিতের মত অনীলকে কোথায় রাখিয়া আসিয়া নীহারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে মগ্ন হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশার কুহকে।

নিশীথে পূর্ব্বোক্ত নদীতীরস্থ বাটীতে সকলেই নিদ্রিত। কেবল একজন প্রহরী নদীমুখস্থ আলোকময় ফটকের রাস্তায় প্রহরণস্কন্ধে টলিতে টলিতে পায়চারী করিতেছিল। উচ্চ প্রাচীরের মধ্যস্থিত বাটীর উদ্যানে সিউলী ফুল ফুটিয়াছে। প্রহরী পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইয়া কত কি ভাবিতেছে। কাম-জয়ী শাক্যসিংহের উপদেশ এই যে, গন্ধদ্রব্যের ঘ্রাণ লইও না. কেন লইও না? তাহার সাক্ষী প্রহরী। বাটীর চতুর্দ্দিকে শিশিরাভিষিক্ত বড় বড় ফুলগাছে জোনাকীরা জড়াইয়া

ধক্ ধক্ করিতেছিল এবং দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আলোক দুই জায়গায় জ্বলিতেছিল, ফটকে এবং নদী-দিকস্থ কক্ষোপরি। কক্ষের মেজে গালিচায় মণ্ডিত। তদুপরি দুই খানা চেয়ারে পূর্ব্বোক্ত দুইটী রমণী চোখে চোখ মিশাইয়া বসিয়া আছেন। দক্ষিণচেয়ারস্থিতা উজ্জ্বলশ্যামাঙ্গিনী এবং উত্তরে নীহার। শ্যামাঙ্গিনীর চক্ষু উজ্জ্বল, মর্ম্মভেদী এবং তাহা হইতে জ্যোতিঃ ঝক্ ঝক্ করিয়া পড়িতেছে। নীহারের চক্ষু অনুজ্জ্বল ও চঞ্চল। তিনি শ্যামাঙ্গিনীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিশাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যেন শ্যামাঙ্গিনীর দৃষ্টির সহিত না মিশিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, মনোবিজ্ঞানবিদ্ হরীশদাদা বলেন, আমরা যদি বাল্যকাল হইতে নিঃস্বার্থ সমাজে থাকিতাম, তাহা হইলে নিজের সুখের আশা কাহাকে বলে, তাহা জানিতাম না এবং এখন আমরা যাহাকে স্বার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করি,সেই ঘৃণিত স্বার্থকে নিঃস্বার্থ ভাবিতাম। আর, একটী আত্মা অন্য আত্মার সহিত মিশানকে স্বার্থ বলিয়া জানিতাম, সন্দেহ নাই। প্রেম এই কথাটী সামান্য কথার মত কহা যায়, কিন্তু জননী ভিন্ন যাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে দেখা যায় না, তাহা কাহার নিকট যে শিক্ষিত হইয়াছি, এমন নহে। কারণ শিশু সমবয়স্কদিগকে ও চাঁদকে স্বভাবতঃ ভাল বাসে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ভালবাসাকে কেহ শিখাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা মিথ্যা। আমি জানি, প্রথমে কোন কাজ শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষকের কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমে কোন কথা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষক কিরূপ কহিয়াছেন তাহা মনে করিতে হয়। তাহা নিত্য ব্যবহারে অভ্যাস হইয়া গেলে আর শিক্ষককে মনে হয় না, আপন হইতে জানিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরের শিক্ষায় প্রথমে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। শিশুরা স্বাধীন, পবিত্র ও স্থির ভাবে চাঁদকে, আলোককে

ও শিশুকে স্বয়ং ভাল বাসিতে শিখিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাই বলি প্রেম আত্মা। প্রেম কামের বিরুদ্ধাচারী। যেখানে কাম থাকে সেখানে প্রেম থাকে না এবং যেখানে প্রেম থাকে সেখানে কাম থাকে না। প্রেম অপর আত্মাকে লইয়া আপনার সহিত যোগ করে বলিয়া প্রেম আত্মা। তাহা আত্মা না হইলে অপর আত্মাকে যোগ করিতে পারিবে কেন? কাম আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে, আত্মার জিনিষ হইলে কখন তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিত না। প্রেম, ধৈর্য্য প্রভৃতি যেগুলিকে মানসিক গুণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি, সে গুলি সহজাত। কুগুণ যাহা আত্মাকে আলোড়িত করে, তাহাদিগকে অজ্ঞ লোকেরা আমাদের মনে স্থাপিয়া দিয়াছে। দিদি! অজ্ঞলোক-দত্ত কুগুণের বশীভূত হইবে কেন? হরীশদাদা আরও বলেন, সুখ সুখ করিয়া অনেকে উন্মত্ত হইয়া দৌড়িতেছে, তাহা আমাদিগকে অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া দিয়াছে যে, ঐ ঐ কাজে আমাদের সুখ, নইলে আমরা জানিতাম না। সুখ অন্য কোথাও নাই, আপনার মনে আছে। যখন তুমি অস্থির হইয়াছ, মনে যখন তোমার সুখ নাই, তখন তুমি সেখানে যাইয়া কি করিয়া সুখী হইবে?

নীহার। অজ্ঞ লোকেরা সুখ বলিয়া দিয়াছে, কি করে জানিব?

লজ্জা। বাল্যকাল হইতে আপনার জ্ঞানের বিষয় আলোচনা কর, স্পষ্ট দেখিবে, যে সুখের জন্য তুমি ব্যস্ত, তাহা দুষ্টাদিগের কাছ হইতে আসিয়াছে। দিদি! কল্পিত সুখে লোভ করিও না।

নীহার হাসিয়া বলিলেন, তোর আত্মায় স্বদেশের ও বিদেশের দার্শনিকদের আত্মা মিশিয়াছে না কি?

লজ্জা। আমি তোমার কথাতে ও হাসিতে দুঃখিনী নই। কারণ, এ হাসি তোমার নয় এবং এ বিদ্রূপের কথা নয়, যদি হইত, তাহা হইলে, তোমার অন্তস্তল হইতে সুকোমল পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে বাহির হইত। তোমার হাসি ও কথা

কুসংস্কারের। কারণ এ বিদ্রূপজনক হাসি ও কথা তোমার কুসংস্কারের জন্মস্থান মস্তক হইতে চঞ্চল ভাবে বাহির আসিল। দিদি! দার্শনিকদের আত্মা সোদী হাড়ীর আত্মারও আছে। সে যাহা হউক্, তুমি যথন কথা কহিতে পারিতেছ না, তখন সেথানে যাইও না এবং তাঁকে প্রাণে মারিও না। তাঁহাকে প্রাণে মারিবার তোমার অধিকার নাই।

এইরূপ বলিয়া তিনি ক্ষণ কাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন, তুমি যে পথে যাইবার উদ্যোগ করিতেছ, সে পথে যে যায় সেই মরে। ইহা তুমি দেখিয়া তথায় যাইবে কেন দিদি! যে কার্য্যে যাইতেছ, তাহা দেখিতে পাইতেছ কি? যে সে কার্য্যে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল। সন্তোষ অপেক্ষা আর কি সুখ আছে?

নীহার রাগিয়া বলিলেন, মিল! এক বার বিশ্রাম করুন। ক্ষণ কাল পরে চঞ্চলচিত্তে বলিলেন, আমাকে আস্তে আস্তে তোমাদের ঘর থেকে বার করে দেও, এখানে আর আমি থাকিতে পারিব না। আমার জিনিষগুলি বার করে দেও, আমি যাই।

লজ্জা কোন উত্তর না দিয়া রাগভরে নীচ তলে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর, নীহারের মনে হইল, লজ্জা ঠিক্ বলিয়াছে। আমারও আত্মা বলিতেছে, সন্তোষের চেয়ে আর কি সুখ আছে? বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই সুখ। নীহার ইহাতে হৃদয় বাঁধিয়া এক ঘণ্টা রহিলেন, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া কে যেন বলিল, আমি কি পাগল, লজ্জা কি পাগল? যে সুখে জগৎ বিভোর, আমি সেই সুখ ছাড়িয়া দিতেছি? আমি এত ক্ষণ অনীলের কাছে যাইলে কত সুখী হইতাম? তিনি আবার ভাবিলেন, সুস্থ থাকাই সুখ, যাকে চিন্তা করিয়া মন চঞ্চল হইতেছে, তাহার নিকটে দুঃখের আশা কি? তিনি আবার অস্থির হইয়া বলিলেন, কে

ধড়ফড় করিতেছে? আমি কেমন সুখে সাঁতার দিতেছি? আমার কি ভ্রম? আমি লজ্জার কথায় ভ্রমে পড়িয়াই সেই সুখের কার্য্যকে ধড়ফড়ানী ভাবিতেছি। তিনি আবার ভাবিলেন, আমি কি দুই জন? এক জন যাহাকে পাপ বলিয়া ভয় পায়, যাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক, যাহাকে ঘৃণা করে, যাহাকেই দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকেই অপর জন সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবার জন্য চঞ্চল হয়, তাহাকে পাপময় ও দুঃখদায়ক বলিয়া জ্ঞান করে না। আবার ভাবিলেন, প্রথমটী আমার শত্রু। কতকগুলি লোক সেই সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যায় পাপ বলিয়া ভয় দেখায় বলিয়া আমি ভয় পাই, দুঃখ কল্পনা করে বলিয়া দুঃখ জ্ঞান করি, ঘৃণা করে বলিয়া ঘৃণা করি। আবার ভাবিলেন, প্রথমটীকে শত্রু বলিলাম বটে, কিন্তু সেটী যখন মনে আসে, তখন দ্বিতীয়টী আগুনের পর্ব্বতের মত সরিয়া যায়। দ্বিতীয়কে মহাকষ্টের জিনিষ বলিয়া বোধ হয় কেন? সকলের কথার দরুণ, নইলে সুখ। আবার ভাবিলেন, মামা কি মনে করিবেন? পিতা, মাতা, ভ্রাতা সইটী কি মনে করিবেন? দেশের লোকেরাই বা কি মনে করিবেন? আবার ভাবিলেন, তাঁদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তাঁদের জন্য কি আমি সুখ ছাড়িয়া দিব? আমি যদি সুখে রহিলাম, তাঁদের বলায় আমার কি হইবে? লজ্জা ত জিনিষ দিল না, যাই বা কেমন করে? এত দিন ত জিনিষ পরিয়াছি, কৈ তাহাতে ত কোন সুখ পাই নাই? ভাল, অনীলের জন্য সংসার না দেখিতে পাই, কিন্তু অনীলের মুখ দেখিতে পাই না কেন? অনীলের কি দোষ? ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার লজ্জা পালাইল, গা কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এক ক্ষণ যদি তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতাম, কত সুখ পাইতাম। কবে যাইব? আজি না পরশু? যদি মরিয়া যাই, তবে ও

সুখ হইল না? যদি অনীলের কিছু হয়, তবে ত মানবজন্ম ব্যর্থ হইল? আজিই যাইব। আজ কত ক্ষণে? এই দণ্ডে। না, এ জন্মে কেবল পিতা মাতার সেবা করিয়া যে সুখ, সেই সুখ কিনিব। পরজন্ম যে হবে, তার নিশ্চয় কি? তবে ত সুখ একেবারে হারাইলাম। পরের সেবা করিয়া সুখ লাভ করিব? স্বাধীন হইব না? আমায় ধিক্। এ বুদ্ধি আমায় কে দিল? আমি গোঁড়া হইলাম কবে থেকে? যে সময় ভাবনা করিয়া কাটাইলাম, এত সময়ে কত সুখ লাভ করিতাম। দরয়ানকে মামা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যাই বা কেমন করে? ইংরাজের মুল্লুক, এখানে সকলেই স্বাধীন। আমি যদি মামাকে না মানি, তবে তিনি আমার কি করিতে পারেন? তৎপরে নীহার চেয়ার হইতে নদীদিকস্থ ফটকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দরয়ান ফটকের কাছে একখানা চৌকীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন এবং দেখিলেন, কবাট বন্ধ। মনের দুঃখে ফিরিয়া আসিলেন এবং লজ্জাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। জানালার একটা রেল ভাঙ্গা ছিল। তাহা খুলিয়া লম্বমান রজ্জু ধরিয়া তিনি ফুলবাগানে নামিয়া আস্তে আস্তে ফটক পার হইলেন। দরওয়ান তাহার কিছুই জানিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই নদীতে দুই বন্যা।

নদীতে বন্যা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে পড়িল। তাহা দেখিয়াও নীহার একটা শ্মশানের কলসীকে বক্ষে স্থাপিয়া নদীতে

ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তাঁহার কামাভিভূত মনে কিছু-মাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। নীহারের চঞ্চলতা দেখিয়া নদী যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে তীরে লাগাইয়া দিল। নীহার তীরে উঠিয়া সিক্তবসনে নদীর রাস্তা পার হইয়া ময়দানস্থ রাস্তায় নামিলেন। শবভোজীরা দস্যুর মত তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার শরীরে ভয় নাই। তিনি মাঠ পার হইয়া ধীরে ধীরে এক গিরির উপরি উঠিতে উঠিতে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তদীয় শরীর ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, রক্তের নদী ছুটিল। তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। নিশ্চেষ্ট না হইয়া তিনি অতি কষ্টে গিরির উপরি উঠিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমাস্য হইয়া চলিলেন। একখানি আলোক-ময় পর্ণকুটীরের পর্ণকবাটে আঘাত করিলে, এক জন কবাট খুলিয়া দিল। নীহার তাহাতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, চল, চল, আর দেরি কর কেন? এখানে থাকিলে মামা টের পাবেন, প্রসূন টের পাবেন। চাকরাণীর মুখে শুনিয়াছি, প্রসূন চটীতে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অনীল কোন উত্তর না করিয়া বাহু দুইখানি দিয়া নীহারকে সস্নেহে আঁটিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া তাহা অশ্রুজলে ভিজাইলেন। তিনি নির্ব্বাক্, নিশ্চল। তদীয় চক্ষু হইতে বেগে অশ্রু পড়িতেছে। নীহার নির্ব্বাক্ কিন্তু কাঁপিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। তিনি অস্থিরকণ্ঠে বলিলেন তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? কাঁদিতেছ কেন? অনীল স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, কেন কাঁদিতেছি জানি না। অনেক দিন হইতে—এই কথা বলিলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

নীহার। কাঁদিলে কি সুখ?

অনীল বলিলেন, আমি বোবা, তোমার মত মনের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। ইহা শুনিয়া নীহার স্তম্ভিত হইলেন। তদীয় হৃদয়ের আশাদীপ নিবাইয়া গেল, কিন্তু ইহা একেবারে

নিৰ্ব্বাপিত হইবার নহে. পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিলে তিনি বলিলেন, এখন কাঁদিবার সময় নয়, কাঁধ থেকে মুখ লও। অনীল স্কন্ধ হইতে মুখ লইয়া নিমেষশূন্য নয়নে নীহারের মুখের দিকে এবং হরিণের চোখের মত নীহারের চোখ দুইটীর দিকে চাইয়া রহিলেন। উন্মত্ত হইয়া তিনি নীহারের কটাক্ষবর্ষী চক্ষুকে শত শত বার চুম্বন করিলেন। নীহার কাঁপিতে কাঁপিতে অনীলকে বাহুলতা দিয়া সবলে আঁটিয়া ধরিলেন। অনীল বলবান্ বালকের ন্যায় অবলীলাক্রমে নীহারকে অঙ্কে তুলিয়া দোলাইতে লাগিলেন। তদীয় চুম্বনে নীহার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অনীলের স্নেহ বন্যার জলের ন্যায় অনবরত বাড়িতেছিল। ইহাতে নীহারের ক্রোধ হইল। তিনি বলপূর্ব্বক অনীলের কোল হইতে নামিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন, চল, আর পাগলামীতে কাজ নাই। অনীল নীহারের কথায় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, নীহার! তুমি রাগ করিলে কেন? রাগ করিবে বৈ কি। আমি পাপিষ্ঠ ও ক্ষিপ্ত, তোমা হেন পুণ্যহৃদয়াকে কোলে লইবার যোগ্য নহি। পাপ হোক্ আর যাই হোক্, আমি আমার এই ভাবকে তাড়াইতে পারিব না। ইহা ব্যতীত, তোমার অন্য কোন ভয় নাই। তোমার সতীত্বরত্ন কখন অপহৃত হইবে না। নীহার অনীলের এরূপ হৃদয়ভাব দেখিয়া হাসিলেন এবং আমার সঙ্গে আইস বলিলেন। অনীল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনীলের পশ্চাৎ পরিচারিকা দূতী চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাদের পার্শ্বে একটা গাছ পড়িল। তাহা দেখিয়া অনীল থামিলে নীহার জিজ্ঞাসিলেন, তুমি থামিলে কেন?

অনীল। তুমি এই বৃক্ষের কাছে শপথ করিয়া বল, হে বৃক্ষ! তুমি যেমন গিরির বুকের উপর নিশ্চলভাবে রহিয়াছ, আমিও তেমনি অনীলের বুকের উপর নিশ্চলভাবে থাকিব।

ইহা শুনিয়া নীহার অস্থিরভাবে অনীলকে জড়াইয়া তদীয়

মুখচুম্বন করিলেন। অনীল আনন্দে ফুলিয়া উঠিলেন। নীহারের আশাদীপ নিবিল। তিনি বিমর্ষভাবে শপথ করিয়া অনীলকে বলিলেন, তুমি শপথ করিলে না? অনীল শপথ করিয়া বলিলেন, গিরি! তুমি যেমন তরুকে বুকে ধারণ করিতেছ, আমি তেমনি নীহারকে বুকে রাখিয়া চিরকাল বিভোর হইয়া থাকিব। তৎপরে অন্ধকার নিশায় তিন জনে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে কোন ভয় নাই। তন্মধ্যে অনীল কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া নীহারকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, নীহার! পূর্ব্ব কালের মনীষীরা নরনারীর হৃদয় জানিতেন কি? নীহার এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

অনীল। যদি একজন দয়াময় সর্ব্বস্রষ্টা থাকেন, তবে তাঁহার আমাদিগকে সৃজন করিবার উদ্দেশ্য কি?

নীহার। জীবনকে সুখে রাখিতে।

অনীল। যদি জীবনকে সুখে রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্য অন্য লোকেরা একমাত্র সেই উদ্দেশ্যপথে কাঁটা দেয় কেন?

ইহা বলিয়া অনীলের বাক্‌রুদ্ধ হইল। নীহার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমি কথা কহিতেছ না যে? ইহা শুনিয়া অনীলের ক্রোধ পলাইল।

নীহার। এত অন্ধকারে আমার মুখ দেখিতে পাইতেছ কি?

অনীল। যখন তুমি লুকাইয়া ছিলে, তখনও তোমাকে দেখিতে পাইতাম, এখন পাইব না?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আনন্দে নিরানন্দ।

অপরাহ্ণে দ্বাবিংশবয়স্ক উন্নতকার্ত্তিককায় একটী যুবক একাদশবর্ষবয়স্কা দেববালাকৃতি একটী বলিকার হস্ত ধরিয়া ছাতের উপরি পাইচারি করিতেছিলেন। অন্যান্য ছাতে যাহারা পাইচারি করিতেছিল, তাহারা এই ছাতের যুবক, বালিকা ও গঙ্গের মনোরম দৃশ্য দেখিতেছিল। যুবক ও বালিকা পূর্ব্বদিকস্থ হর্ম্ম্যশ্রেণীর উপরি নরনারীদিগকে দেখিতেছিলেন। তাঁহারা সেইখান হইতে চক্ষু ফিরাইয়া পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্যকে ডুবিতে দেখিয়া নিলীমা চীৎকার করিয়া দেহখানি নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন—

আকাশ ছেড়ে ধীরে ধীরে সূর্য্য ঠাকুর যায়।
বুকের নিধি হারিয়ে দিদীর মলা পড়্‌লো গায়॥
শিশির ঝরে কেঁদে মরে ছেড়ে ভাল বাসা।
সোণার রংটী হোল মাটি ফুরিয়ে গেল হাসা॥

যুবক বালিকার পানে মর্ম্মভেদিনী দৃষ্টিতে ক্ষণ কাল চাইয়া রহিলেন। যুবকের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল। তিনি একবার কাঁদিলেন। বালিকা তাহা জানিলেন না। যুবকের কান্নার মর্ম্ম এই যে, দেববালা সংসর্গদোষে নারকী হইবে।

যুবককে চাইতে দেখিয়া বালিকা উৎসাহে পূর্ব্বভঙ্গিতে আবার বলিলেন—

ইন্দ্র সূর্য্য দুজনেতে এক আকাশে ভাসে।
ইন্দ্র রসে তোষে মাঠে, সূর্য্য রোষে চুষে॥

দুজনে ত দেবতা বটে সূর্য্য কেন রাগে ?
সূর্য্যের সময় মাঠ থর থর ইন্দ্রের সময় মাগে ॥

যুবক এই ভঙ্গি গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। বালিকা যুবকের চোখে চোখ মিশাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দাদা ! মনীদিদী আরও বলেন—

সকলেতে ঠাণ্ডায় শোয়ায় আগুনের পর রাগ।
সূর্য্য আগুন করিস খুন তুই মাঠ কিসে তোর মাগ ?

এটী আমাকে বড় ভাল লাগে না কেন দাদা ? যুবককে কোন উত্তর করিতে না দেখিয়া বালিকা বলিলেন, দাদা ! তুমি সারা দিন সারা রাত এমন করে কি চিন্তা কর ? সকলে তোমাকে পাগল বলে। ইহা শুনিয়া অনীল ঈষৎ হাসিলেন। আমাদের খামারে শত শত ধানের গাদা দেখিতেছ কি দাদা ? এই কথা বলিয়া নীলিমা পূর্ব্বরীত্যনুসারে পুনরায় বলিলেন—

পেট পূরাতে জন্ম ক্ষেতে খামারেতে এসো।
আশ্বিনের পূর্ণিমার দিনে লালের লক্ষ্মী বসো ॥
পরের তরে পরাণ ছাড় তাই তরে মা লক্ষ্মী।
পরকে দিলে এত মিলে তুমি সত্য সাক্ষী ॥

দাদা এ বছর লক্ষ্মীপূজার রাতে আমাকে কাছে লয়ে, যাত্রা শুনতে বসিবে তো ? সলীল গম্ভীরভাবে অনিচ্ছা সত্বে বলিলেন, বসিব।

নিলীমা। তবে তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া বল। ইহা বলিয়াই তিনি সলীলের সুকুমার রক্তবর্ণ করতল লইয়া আপনার কাল মসৃণ চুলের রাশির উপর রাখিলেন। যেন কাল চুলের রাশির উপর সলীলের রক্তবর্ণ করতল স্থাপিত হওয়াতে, বোধ হইল, যেন সর্পের মস্তকে সূর্য্যকান্তমণি, যেন বিষ্ণুচক্রের উপরি লাল অপরাজিতা, যেন অমাবস্যা নিশিতে নদীহৃদয়ে ভাসমান দীপ, যেন তমঃপূর্ণ নিশিতে তমালশাখায়

জোনাকীরাশি, যেন নিবীড় অন্ধকারে আকাশপথে বেলুনযন্ত্র, যেন কাল চুলের রাশির উপরি স্বর্ণের পানপাতা, যেন শ্যামার বিশাল বক্ষে স্বর্ণপদক, যেন চিক্‌চিকে কাল ঘোড়ার ললাট-দেশস্থ স্বর্ণাক্ষরখচিত জয়পত্র, যেন কৃষ্ণের শীর্ষে স্বর্ণমুকুট, যেন সুশ্যামাঙ্গিনীর সুঠাম করোপরি লাক্ষারসের উল্কী. যেন কোকিলের লোহিতাক্ষি, যেন পল্লবশালী দাড়িমগাছে দাড়িম-ফুল, যেন কালিন্দীর জলে স্বর্ণকলস, যেন কুজ্ঝটিকায় বিদ্যুদগ্নি. যেন মসীপাত্রে স্বর্ণঢাকুনী, যেন ত্রিশূলে জড়িত রক্ত জবার মালা, যেন অপুত্র অথচ কৃপণ তেজস্বী সম্রাটের সাম্রাজ্য, যেন বিজ্ঞানচিন্তকের মৃদু বিজ্ঞানরশ্মি, যেন জটায়ুর প্রমুখাৎ সীতার সংবাদ. যেন যুবতীর কেশভরা মস্তকে লাল-মোহন এবং যেন কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভোপরি স্বর্ণকলস স্থাপিত রহিয়াছে।

এমন সময়ে এক জন দাসী আসিয়া সলীলের হস্তে একখান পত্র দিল। তাহা খুলিয়া তিনি পড়িলেন——

ভাই সলীল! দিন কতক হইল, এক জনের মুখে শুনি-লাম, তুমি দেবগড়ে রহিয়াছ। ঝরণীর জীবনবৎ সংবাদদাতার মুখে জীবনপ্রদত্ত কথাগুলি পাইয়া বোধ হইল, নবজীবন পাই-লাম। হৃদয়ে গুপ্ত রাখিলে প্রেম পবিত্র। কুসংস্কারাপন্নার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি যাইলে, আমাকে একটা কথাও বলিয়া গেলে না। অল্প বয়সে এত দুঃখী হইলে? না হইবে কেন? বঙ্গ দেশের প্রচলিত রীতি, নীতি, ধর্ম্ম সজোরে বলিতেছি কাল্পনিক, তবে কেন না দুঃখী হইবে? ঠকিয়া তোমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। তুমি সকল মিথ্যা ভাবিয়াছ। তোমার কিছুকেই বিশ্বাস নাই। আমি বোধ করি, অবিশ্বাস করিতে করিতে তুমি আপনার আত্মাকেও অবিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছ। সলীল! চিন্তা দুইপ্রকার; একটী কারণানুসন্ধানকারিণী, অপর একটী কারণবিঘ্নকারিণী। কারণানুসন্ধানকারিণী চিন্তা কি?

যে চিন্তা স্থির হইয়া মস্তক তুলিয়া অন্ধকার হইতে উঠিবার জন্য সচেষ্ট হয়, যে চিন্তা কারণ দর্শন করিবে বলিয়া উর্দ্ধে ও সংসারে খুজিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ যাহা দর্শনের চিন্তা, তাহাকেই কারণা-নুসন্ধানকারিণী বলে। তাহা আত্মা হইতে উৎপন্ন। যাহা মনের উপর বসিয়া তাহাকে চঞ্চল করে, যাহা মনোমধ্যে সন্দেহ জন্মায়, যাহা নীচগামিনী, যাহা কারণ খুজে না, যাহা তেজঃ পদার্থে নির্ম্মিত.যাহাকে তাড়াইলে মন শান্ত্যানুভব করে, তাহাকে কারণবিঘ্নকারিণী চিন্তা কহে। কারণবিঘ্নকারিণী চিন্তা কুসংস্কার বা অজ্ঞান হইতে জন্মে। আশা করি, তুমি শেষোক্তটীকে ছাড়িয়া দিয়া প্রথমটীকে অবলম্বন করিয়া স্বদেশের ও আপনার উন্নতি সাধন করিবে। অগ্রজ সহোদরদ্বয়, স্নেহময়ী মাতা, রোগগ্রস্ত পিতা তোমার জন্য অস্থির হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিদারুণ দুঃখ বর্ণনাতীত বলিয়া আমি এই স্থানেই লেখনীকে নিরস্ত করিলাম ইতি তাং ২২ পৌষ, ১২৮০ সাল।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীহরীশ।

পত্র পাঠ করিয়া সলীল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগি-লেন। নীলিমা তদ্দৃষ্টে অস্থির হইয়া তাঁহার গলায় বাহুলতা বেড়িয়া তাঁহাকে পত্রের মর্ম্ম জিজ্ঞাসিলেন। সলীল তাঁহার কথার উত্তর দিলেন না। নীলিমা অঞ্চল দিয়া সলীলের চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাণেরে বিদায় কে করে স্বেচ্ছায় ?

প্রভাতকালে সলীল স্নেহময়ী জননীর নিকট যাইয়া বলিলেন, মা! কিছু দিনের জন্য আমাকে বিদায় দিউন, আমি বাটী যাইব। ইহা শুনিয়া মাতা অস্থিরা হইলেন। সলীল তদীয় মৃত পুত্র নরেন হইয়া তাঁহাকে একবৎসর কাল শান্তিনীরে ভাসাইতেছিলেন। স্নেহময়ী ধীরতা-সঙ্গিনীর আশ্রয় লইয়া বলিলেন, সলীল! যাও, কিন্তু জানিও তোমার মা একজন নহেন। ইহা বলিয়া তিনি নির্ব্বাক্ রোদনে হৃদয়ের বেদনা জানাইলেন। সে রোদন অভিনেত্রীর নয়, তাহার উপমা নাই। সলীল ভক্তি সহকারে মাতার শ্রীচরণে মস্তক নত করিয়া অপসৃত হইলেন। যাইবার সময় মাতা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, সলীল! তুমি নীলিমাকে প্রবোধ দিয়া যাইও। সলীল নীলিমার কাছে বিদায় লইতে চলিলেন। তিনি বাটীর উপরিতলের উত্তরপ্রান্তস্থিত সুচারু কক্ষে নীলিমাকে শয্যোপরি শয়ানা দেখিলেন। কক্ষের বাতায়নগুলি খোলা ছিল। তন্মধ্যে প্রাতঃসমীরণ বহিতেছিল এবং তাহা সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইতেছিল। সলীলের পদশব্দ শুনিয়া নীলিমা শয্যা হইতে স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সলীলকে ধরিয়া স্বীয় শয্যায় বসাইয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফোঁ ফোঁ শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সলীল ছল ছল নয়নে শোকপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, নীলিমা দিদি! আমাকে

দেখিয়া তুমি আজি কাঁদিতেছ কেন? বালিকা হৃদয়বিদারক কণ্ঠে উত্তর করিলেন, তুমি না বাড়ী যাবে? ইহা বলিয়াই তিনি সলীলের বুক হইতে মুখ তুলিয়া দুই খানি বাহুলতা দিয়া তদীয় গলদেশ ছাঁদিলেন এবং তদীয় চক্ষুতে চক্ষু মিশাইয়া নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয়, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কারণ অশ্রুজলে তারা দুইটীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সলীলের নত চক্ষু দুইটী নীলিমার চক্ষু দুইটীর দশা পাইয়াছে। দুই জনের হৃদয় এক এক বার স্ফীত হইতেছিল। সলীল নীলিমার সুকুমার দেহখানিকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি স্বীয় কোঁচার প্রান্ত দিয়া তদীয় অশ্রুজলার্দ্র চক্ষু দুইটী মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্ববৎ রহিল। তিনি স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, নীলিমা! আমি বাড়ী যাব বলিযা তুমি কাঁদ কেন দিদি? আমি বাড়ী গেলে আর কি আসিব না যে, তুমি কাঁদিতেছ? এমাসে আসিতে পারি না পারি সে মাসে নিশ্চয় আসিব। এই কথা বলিয়া তিনি হঠাৎ নির্ব্বাক্ হইয়া গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। যে ব্যক্তি ঈদৃশ চিন্তার দাস, তাহার কথা তাহার প্রতিজ্ঞা সমস্তই অলীক। সলীলকে চিন্তা করিতে দেখিয়া নীলিমা গদগদ স্বরে বলিলেন, দাদা! তুমি আর আসিবে না, যদি আসিবে, তবে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিলে কেন? এত ভাবিতেছ বা কি জন্য? হরি বাড়ী যাইবার সময় মাকে আসিব বলে অনেক ভাবিয়াছিল, তাই টাকা লইয়া গিয়া আর আসিল না। যে আসিব বলিয়া চিন্তা করে, সে আর আইসে না। নীলিমার এই কথা শুনিয়া সলীল ভাবে বিভোর ও জ্ঞানশূন্য হইয়া তদীয় চাঁদমুখে চাঁদ সংস্থাপন করিয়া স্নেহের ও শোকের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, তুমি নিজেই বল, আমি মিথ্যা কথা বলি না, তবে আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না কেন? নীলিমা কাতরস্বরে বলিলেন, প্রবোধ দিবার জন্য সকলেই মিথ্যা কথা বলে। মা ত কখন মিথ্যা কথা বলেন না, কিন্তু মনী দিদী যেদিন

বাড়ী যাইবার সময় পাল্কীতে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে দিন মা তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য মিছামিছি বলেছিলেন, মনি! তুই কাঁদিস্ কেন? এ মাস গেলে আমি তোকে আনিব। দাদা! মনী দিদি আমাকে ছাড়িয়া কি করিয়া আছে? আমিই বা তাঁকে ছাড়িয়া কি করিয়া আছি? এই কথায় সলীলের বুকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি বালিকার কাছে পরাস্ত ও নির্ব্বাক্ হইয়া গম্ভীর ভাবে ভাবিতে লাগিলেন। পরাস্ত হইলে চলিবে না ভাবিয়া সলীল বলিলেন,দিদি! তুমি যদি অবিশ্বাষ কর, সেইজন্য তোমার কাছে আমার ব্যাগ থাকুক।

নীলিমা। তুমি কি আর একটী ব্যাগ কিন্‌তে পারবে না? শুনেছি মায়ের অসুখ হইয়াছে বলে তুমি যাবে। আমাকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। ক্ষণ কাল ভাবিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমি গেলে মা অস্থির হবেন। সে বাড়ীর মা ভাল হলে, তুমি আস্‌বে ত? আমার মাথায় হাত দিয়া বলে যাও দাদা!

ইহা শুনিয়া সলীল ভাসিতে লাগিলেন।

নীলিমা। যখন তুমি আমার মাথায় হাত দিতে ভাবিতেছ, তখন তোমাকে মিথ্যা বলা।

এই কথা বলিয়া নীলিমা কাঁপিতে লাগিলেন। এ শোকের কম্পন। ইহা স্থির হইলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, মা যাই করুন, এই কথা বলিয়া তিনি নির্ব্বাক্ হইলেন। তৎপরে সলীলকে অগত্যা শপথ করিতে হইল। প্রথমে তিনি নীলিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। তাহাতে নীলিমা সন্তুষ্টা না হওয়াতে পুনর্ব্বার তিনি তদীয় মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। নীলিমা প্রথমে আহ্লাদিতা পরে বিমর্ষা হইয়া বলিলেন, দাদা! আমি এত দিন থাক্‌বো কি করে?

সলীল। দিন দেখিতে দেখিতে কেটে যাবে।

নীলিমা। দিন দেখিতে দেখিতে যায় সত্য, কিন্তু যে দিন

মনী দিদী বাড়ী যাইবার দিন হইতে তুমি এখানে আসিবার দিন পর্য্যন্ত এত বড় বড় দিন হয়েছিল কেন ?

এই মধুমাখা কথা শুনিয়া সলাল উন্মত্তের মত নীলিমাকে কোলে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, পরে অশ্রুজলে তাঁহার স্কন্ধদেশ ভাসাইয়া দিলেন। যেমন মৃত পতির দাহান্তে পতি-পরায়ণা করস্থ আয়তি ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন প্রসূতি অঙ্কশায়া মৃত সুকুমারকে অঙ্ক হইতে ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন পরযুবতীর অলঙ্কার পরিয়া নির্ধনা যুবতী তাহা ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন অভিমানী কামুক কামবৃত্তি ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন নির্ধন ব্যবসায়ী ব্যবসায় ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন প্রেমিক কুসমাজের উৎপীড়নে রহস্য প্রেমপ্রতিমা ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন উৎসাহহীন কবি কবিতা রচন ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন নির্ধন দেবভক্ত দেবোৎ-সব সকল ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, যেমন নিশাবসানে পতিপ্রেমাসক্তা পতির শয্যা ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারে না, সেইরূপ সলাল ভৃত্যের উৎপীড়নেও নীলি-মাকে কোল হইতে ছাড়িবে ছাড়িবে করে ছাড়িতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বকালে নারীগণ যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে স্নেহের কুমারকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিত, সেই-রূপ সলীল অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবনসর্ব্বস্ব নীলিমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। গঙ্গাসাগরে হৃদয়সর্ব্বস্ব সন্তান ত্যাগ করিয়া জননীগণ যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া যাইত, সেইরূপ নীলিমাকে ত্যাগ করিয়া সলীল যাইতে লাগিলেন। নীলিমা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফোঁ ফোঁ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সলীল বলিলেন, তুমি আসি-তেছ কেন ? বাটীতে ফিরিয়া যাও।

নীলিমা। আমি অনেক দূর হাঁটিতে পারি।

নীলিমা সলীলের কথা মানিলেন না এবং গঙ্গ পার হইয়া খালের ধার পর্য্যন্ত যাইলেন। সলীল একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিলেন। নৌকা খুলিয়া দিলে নীলিমা সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। সলীল তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কোন উত্তর দিলেন না, কেবল সলীলের মুখের দিকে চাইয়া রহিলেন। নৌকা খালের মধ্যস্থলে যাইলে নীলিমা ধীরে ধীরে তীর হইতে পান্‌শীর দিকে চাইয়া জলে নামিতে লাগিলেন। কটীদেশ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল, তথাচ তিনি নৌকার প্রতি চাইয়া নামিতে লাগিলেন। নৌকার লোকের নিষেধবাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। জল চিবুক স্পর্শ করিলে বাড়ীর ভৃত্য তাঁহাকে জল হইতে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া বাটীর দিকে চলিল। তাঁহার মুখে কথা নাই, দৃষ্টি কেবল নৌকার দিকে। নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তিনি ক্ষণ কাল অস্থির হইয়া পরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গেল, তিনি তাহার কিছুই জানিলেন না। তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি মায়ের কাছে রহিলেন না। যে ঘরে দাদা শয়ন করিতেন, তথায় চাইয়া দেখিলেন, দাদা শুইয়া নাই, ছাতে গিয়া দেখিলেন, দাদা তথায় নাই এবং ছাত হইতে নামিয়া যেখানে দাদা বসি-তেন সেখানে যাইয়া দেখিলেন, দাদা বসিয়া নাই। তিনি আবার পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্থানে ঘুরিলেন, কোথাও দাদাকে পাই-লেন না এবং প্রভাতে একজন বালিকাকে জিজ্ঞাসিলে সে বলিল, তিনি যে বাড়ী গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নীলিমা মূর্চ্ছিতা হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নরকে।

অনীল ও নীহার তিন দিবারাত্রি হাঁটিয়া এক গিরির পাদ-দেশে উপস্থিত হইয়া একজন সাঁওতালের নিকট একটি কুটীর কিনিয়া লইলেন। তাঁহারা অনেক অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কোন অসদ্ভাব ছিল না। উভয়ে যে কুটীরে রহিলেন তাহা দক্ষিণদুয়ারী। তাহার পূর্ব্বে দৃষ্টিরোধকারিণী গিরিশ্রেণী, পশ্চাতে (উত্তরে) পশ্চিমে, দক্ষিণে শালের পাতলা বন। বনে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারা যায়। তথায় কুড়মী ও সাঁওতালদের ছোট ছোট ঘর রহিয়াছে এবং শিকারী কুক্কুরদল, কুক্কুটদল, সাওতাল ও কুড়মীর রণবেশী বালকদের দল সর্ব্বদা বেড়াইতেছে। কুটীরের পশ্চাৎ ভাগের বাতায়ন দিয়া বনের সমস্ত দেখা যায়। আহারের জন্য বহুসংখ্যক কুকুর ও কুক্কুট কুটীরের চতুর্দ্দিকে বেড়ায়। অনীল দয়াপরবশ হইয়া সকল-কেই পরিতুষ্ট করেন এবং নীহার একখানি রজ্জুনির্ম্মিত খাটে সর্ব্বদা শুইয়া থাকেন। অনীল রন্ধন করিয়া সস্নেহে নীহা-রকে খাইতে দেন। নীহার তাহা আহার ও শয্যায় শয়ন করিয়া নিরন্তর ভাবেন। অনীল অবকাশক্রমে নীহারের শীর্ষ-দেশে বসিয়া নানাবিধ নীতিপ্রেমগর্ভ উপাখ্যান বলেন। নীহার অমনোযোগে তাঁহার কথায় সায় দেন। অনীল নীহারকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া সোহাগ করিতে করিতে তদীয় মুখচুম্বন করেন ও তাঁহাকে দোলাইতে থাকেন। ইহাতে নীহার কাঁপিতে

কাঁপিতে তাঁহাকে এক এক বার জড়াইয়া ধরেন। অনীল নীহারকে তদীয় অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছু নয় বলিয়া উত্তর দেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে নীহার এক দিন হঠাৎ সুস্থ হইলেন এবং অনীলের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কয়েক দিন যাপন করিলেন। আজি বৈকালে দুই জনে মুখামুখী হইয়া বসিয়া দুই জনের রূপ দুই জনে অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। ভৃত্য তামাক সাজিয়া অনীলের হাতে দিল। অনীল তাহা খাইয়া নীহারকে দিলেন। নীহার তামাক খাইতে খাইতে অনীলকে বলিলেন, তোমাকে আজি এক উপাখ্যান বলিব। তুমি কি আমার ছোট দাদাকে জান?

অনীল। আমি নরেন বাবুকে জানি। তিনি আমার ক্ল্যাশ-মেট্। যে অবধি তিনি কলেজ ছাড়িয়াছেন, সেই অবধি আর তাঁকে আমি দেখিতে পাই না।

নীহার। তাঁহাকে দেখিতে পান না কেন, তাহার কারণ আছে।

অনীল। জান্‌তে আর কি বাকী আছে? তোমাদের যে প্রশস্ত জমিদারী? তাহাতে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইলে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া অসম্ভব।

নীহার। না, তা নয়, আপনি তাঁর ভিতরের সংবাদ কিছু জানেন না।

অনীল। উৎসাহী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সংবাদ কি?

নীহার। তোমাকে তাহা বলিলে কি হইবে?

অনীল। নীহার! বল বল। তোমার কথা শুন্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।

নীহার। তবে শুনুন, এবং কথকের মান্য রাখিতে যেন ত্রুটি না করেন। আজি পাঁচ বৎসর হইল, যখন ছোট দাদা কলেজে পড়েন, তখন সুশীলা বৌ যুবতী। যৌবন-জল বহির্গত হবে

বলে তোমার নীহারের মত বৌয়ের বুক্ ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। ইহা বলিয়া নীহার হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিস্মাথা হাসিতে অনীলের বুকের ভিতর কে যেন হাসিয়া উঠিল। নীহার হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন, বৌ চলিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়িত, আমি কি না?

অনীল। তুমি যৌবনভরে ঢলিয়া না পড়িলেও তোমার হৃদয়ে এত আনন্দ যে, তার ভার তুমি বহিতে অশক্ত।

নীহার। সে যাক্, সুশীলাকে ছোট দাদা বড় ভাল বাসিতেন না। কে কাহাকে অকারণ ভাল বাসে? তিনি সদা লেখা পড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রিকালে বৌয়ের ঘরে এক বার আসিয়া এ বৎসর হরি পাশ হইবে, গত বৎসর প্রবোধ এম, এ দিয়াছেন, অমুক বাবু সিবিলীয়ন হইতে বিলাত গিয়াছেন, আমি কবে যাইব? ক্ষণ কাল এইরকম গল্প করিয়া বৌকে কোলে তুলিয়া দুই একটা চুম্বন ঝাড়িয়া হাবার মত ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং রাত্রি থাক্‌তে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। ইহাতে বৌয়ের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তিনি ছোট দাদাকে বিষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। স্বার্থলাভ না হইলে কে কাহাকে ভাল বাসে? তৎপরে বৌ স্বাধীনভাবে বাপের বাড়ী যাইলেন এবং আর আসিবার নাম করিলেন না। বৌয়ের দুই একটা কলঙ্কও শুনা গেল। আমাদের সংসারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কিন্তু দাদা তাহার কিছুই শুনেন নাই।

অনীল। তার পর কি হইল?

নীহার। ছোট দাদা বৌকে পত্র লিখিলেন। তাহার খসড়াটা আমি দেখিয়াছিলাম। পত্রের মর্ম্ম এই—প্রিয়তমা সুশীলা! তুমি আমাকে না বলিয়া পিত্রালয়ে যাইলে কেন? ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তোমার এখানে না থাকিবার কারণ কি? জানিতে পারিলে আমি তাহা নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইব। ইতি ১২৮০ সাল।

সুশীলা দাদার পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বলি, শুনুন। স্বামিন্! সুখ না দিলে কেহ কাহাকে ভাল বাসে না। সুখ পাইলে কেহ কোথাও থাকে না। ইহার বিপরীত কোথাও দেখিয়াছ কি? দেবগুরু বৃহস্পতি যে সুখকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে তুমি হেয় জ্ঞান কর কেন? যাহারা মুখে ইহার বিপরীত বলে, তাহারা কি সে সুখ ছাড়িতে পারিয়াছে? আপনি ত জানেন, সলমন কি সুখে রহিয়াছিলেন? জার্ম্মন্ দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি লুড্উইগ ফুএয়া বার্ক, আর ডাক্তার বুক্নেয়ার ও তৎশিষ্যেরা কি সুখে উন্মত্ত? বৃন্দাবনের নায়ককে ঈশ্বর বলিয়া সকলে মান্য করেন কেন? বিদেশের কথা থাকুক, বঙ্গভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি রাজরাণীর সঙ্গে কি সুখে ছিলেন? তিনি অন্য কিছু কীর্ত্তন না করিয়া রাধাকৃষ্ণের সুখ কীর্ত্তন করিলেন কেন? চণ্ডীদাস অন্য পথে যাইলেন না কেন? চৈতন্যের উপাস্য দেবতা রাধাকৃষ্ণ হইলেন কেন? "হরি বোল হরি বোল রমনীকে দেও কোল" নিত্যানন্দের এই ধুয়া হইল কেন? রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্রের এত মান্য কেন? বঙ্গকবি মাইকেল উৎসব-বর্ণনায় "কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু পানে" এ গীত গাইলেন কেন? শকুন্তলার সেই সুখভাব পড়িয়া জার্ম্মন কবি গেটী কবিকুলতিলক কালিদাসকে কি বলিয়াছিলেন? বর্ত্তমান কবি নবীনচন্দ্র সুরসিক বলিয়া খ্যাত কেন? বাইরন কোন্ ভাবের কবি?

সুখাভিলাষিণী
সুশীলা!

নরেন দাদা পত্রের মর্ম্ম সমস্ত বুঝিলেন। অনেক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে দিবারাত্রি বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে সরল হইলে তিনি বৌকে বাপের বাড়ী থেকে আনি-

লেন। এখন দিবারাত্রি দাদা বৌয়ের ঘরে থাকেন। বৌগত প্রাণ দাদা এবং দাদাগত প্রাণ বৌ। তাঁহাদের উভয়ের মনোহর যোট বাঁধিয়া গিয়াছে। দুই জনের মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের দুইটী অঙ্গ সদা একটী হইয়া পড়িয়া থাকে। নীহার তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিতে করিতে বিভোর হইলেন। অনীল নীহারের উপাখ্যান বলিবার সমস্ত কারণ বুঝিলেন এবং কেন যে তিনি তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেন, তাহাও বুঝিলেন। অনীলের পবিত্র মন নীহারকে এত দিনের পর এক বার ঘৃণা করিল। যখন নীহার সুশীলার পত্র মুখস্থ বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে নানা তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। পত্র ফুরাইলে নীহার অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি শুনিয়াও শুনিলেন না। সে রজনীতে তিনি নিদ্রা যাইলেন না। হেমবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ থাকিতেও মাছি যেমন ঘা যেখানে সেই স্থান অনুসন্ধান করে, সেইরূপ অনীল নীহারের কথাগুলি স্বীয় দৃষ্টিতে মিশাইয়া, নীহার যাহাদের নাম করিয়াছিলেন, তাহারা যে সে সুখে ও সে ভালবাসায় সত্য সত্যই বিভোর ইহা দেখিতে পাইলেন, তথাচ বিশ্বাস করিলেন না। সেই দিন হইতে, তাঁহার নিদ্রা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সংসার খুঁজিলেন, কাহাকেও সে সুখ হইতে বঞ্চিত দেখিলেন না, তথাচ বিশ্বাস করিলেন না। যাঁহাদিগকে কবিরা ধার্ম্মিক বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সেই সুখে ও সেই ভালবাসায় ভোর হইয়া থাকিতে দেখিলেন। এক এক বার তাঁহার সৎপ্রবৃত্তি তাঁহাকে কুচিন্তা হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ কেহ যেন তাঁহার বিপক্ষে বলিত, সুখ ও ভালবাসা ভিন্ন আর কি লইয়া থাকিবে? নীহারের চাকরাণী যে সকল উপন্যাস, কাব্য লইয়া গিয়াছিল, অনীল চিন্তা নিবারণ করিবার জন্য তাহা পড়িতে লাগিলেন। কুকার্য্যে ভালবাসা ও সুখ আছে কি না, ইহা জানাই তাঁহার পুস্তকপাঠের উদ্দেশ্য। তিনি সমস্ত পুস্তকের নায়ক নায়িকা-

দিগকে কুকার্য্যের সুখে লিপ্ত হইতে এবং কুকার্য্যে ভালবাসা লাভ করিতে দেখিলেন। তিনি মেঘদূত ও হংসদূত পড়িয়া কবির সেই সুখের উন্মত্ততা দেখিলেন এবং উদ্ধবদূতে কবিকে উন্মত্ততার হিল্লোলে ডুবিতে দেখিলেন। মৃচ্ছকটিক পড়িতে পড়িতে তিনি বসন্তসেনা নায়িকাকে নীহার ভাবিতে লাগিলেন। ইহা পড়া হইলে তিনি নীহারের দিকে এক বার চাইয়া রহিলেন। তৎপরে বিদ্যাসুন্দর পড়িতে পড়িতে তিনি নীহারকে বিদ্যা সাজাইলেন। ইহা পড়া হইলে নীহারের দিকে ক্ষণ কাল চাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে নীহার আর সে নীহার রহিলেন না। মাসাতীত হইল, তাঁহার গ্রন্থ পড়া সমাপ্ত হইল না। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি নারীরা তাঁহার নিকটে সতী বলিয়া পরিগণিতা হইলেন না। তিনি প্রত্যেক পশু পক্ষীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদেরও সেই বৃত্তি আছে। তাঁহার হঠাৎ বিশ্বাস হইল, এই প্রবৃত্তি ঈশ্বরদত্ত, এজন্য পাশব বৃত্তিকে তিনি ঘৃণাচক্ষে দেখিলেন না এবং তাহাকে পাপ বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। নীহার এই সময়ে জঘন্য শ্লোক ও জঘন্য কথা হাসিয়া হাসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। অনীল স্বেচ্ছায় তাহা স্বীয় কর্ণে প্রবেশ করিতে দিলেন। পাশব বৃত্তি হইতে সংসার উৎপন্ন, তাহা হইতে দুই জনের সুখ, তাহা হইতে ভালবাসার বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি ঈশ্বরকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিলেন। সময় পাইয়া নীহার মৌনভাবে রহিলেন, শয্যায় শুইয়া পড়িয়া থাকিলেন, এবং অনীলকে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অনীল তাঁহাকে সুশীলা এবং আপনাকে নরেন ভাবিয়া স্থির করিলেন। এই রূপে কত দিন পাপ ভরিয়া তিনি স্বয়ং পাপী হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গিরিশিখরে।

হে নিশানাথ! তুমি কেমন হাসিয়া হাসিয়া জগৎকে হাসাইয়া শান্ত হৃদয়ে শান্তিময়ী আকাশদেবীকে রমণ করিতেছ! তোমাকে দেখিয়া আমার এই অপবিত্র জ্বলিত হৃদয়ও শীতল হইল। দেব! তোমার এই রমণ জ্যোৎস্নার বাগান। ঠাকুর! তোমার এই রমণশব্দ অন্বর্থ। আমি যে রমণ করি—বলিয়া যুবক কাঁপিয়া উঠিলেন এবং মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তিনি বাম করতল দিয়া বারংবার বাম চক্ষু হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং ঊর্দ্ধ দিকে বিকট চক্ষু করিয়া বলিলেন, কোন্ মূর্খ ইহাকে রমণ বলে? যাহাকে স্মরিলে মন জ্বলিয়া যায়, মনের সিংহাসন মস্তিষ্কের ঘৃত গলিত হয়, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে, বাহ্যিক দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন আর আন্তরিক, মনশ্চক্ষু এই ষড় বিধ জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন্ মূর্খ রমণ বলে? তাহাতে কি মন মোহিত হয়? না। তাহাতে মস্তিষ্কের ঘৃত গলিয়া প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত কুণ্ডে পড়িয়া, জীবন্মৃত্যু ঘটায়। যাহারা এই সুখের সৃজন করিয়াছে, তাহাদের মুখে কোটী কোটী বার পদাঘাত করি। দেখিলাম, কাম অর্থাৎ সম্ভোগের ইচ্ছা জ্বলন্ত অগ্নি। কারণ অগ্নি না হইলে কোন বস্তু গলিত, উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয় না। আগুন মনকে কুণ্ডে ফেলাইয়া বীর্য্য অর্থাৎ প্রাণাংশকে বাহির করিয়া দেয়। তাহাতে কি সুখ?

চৌর্য্য নরহত্যা প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা বরং ভাল। কারণ তাহাতে সংসারে থাকিতে পারি, কিন্তু এ কুকার্য্যে সংসারে থাকিতে পারা যায় না এবং ইহাতে মন প্রত্যক্ষ নরককুণ্ডে পড়িয়া থাকে। এ কার্য্যে মনুষ্যের এমন দুরবস্থা হয় যে, আপনার কষ্ট আপনি অনুভব করিবার সামর্থ্য থাকে না। কত বার মনে করিয়াছি, পরীক্ষা করিব এবং পরীক্ষার জন্য কত বার কুকার্য্য করিয়াছি, কিন্তু পরীক্ষা করিতে পারি নাই। ইহাতে অভিভূত হইয়া আপনি যখন আপনাতে থাকি না, তখন তাহার পরীক্ষা করিবে কে? কারণ মন স্থির হইয়া মাথায় না থাকিলে, কোন কার্য্যের পরীক্ষা হয় না। আমি ইহাতে উন্মত্ত হইয়া এক সময় শাক্যসিংহ প্রভৃতিকে অজ্ঞ বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞ নহেন, আমি নিজেই অজ্ঞ। প্রেস্কন বলিয়াছিলেন, কাম মনের বৃত্তি নয়। তাহা সত্য। কারণ আমি যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার কিছুই মনে নাই। আর মনীষীরা যাহাকে পাপ বলেন, তাহা দুঃখ এবং যাহাকে পুণ্য বলেন, তাহা সুখ। আমার হৃদয়ে যে ভালবাসা ছিল, তাহা কোথায় বৃদ্ধি হইবে, না একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমি মনে করিয়াছিলাম, বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাহা ভ্রম। এখন জানলাম, ভালবাসা কি? পরকে সুখে রাখিবার ইচ্ছা। পরকে সুখে রাখিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার প্রাণকে আপনার প্রাণের অপেক্ষা বহুমূল্য ভাবিতে হয়, আপনার প্রাণের সহিত যোগ করিতে হয়, নিজের মন পবিত্র, শুক্র, ধৈর্য্য সাহস ইত্যাদি সমস্ত গুণে বিভূষিত হয়, স্বর্গসুখ অনুভব করে, ইহ কালের সুখের জন্য উন্মত্ত হয়, এবং সংসারে পবিত্রভাবে বেড়াইতে পারে।

আপনার সুখের ইচ্ছাকে কাম কহে। সুখের ইচ্ছা করিলে মনের পবিত্রতা, উন্নত গমন, নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা অধোগামী হয়, আত্মা দগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইতে থাকে, এবং অন্যে দোরুক্

আর যাই হউক আপনার অভিলাষপূরণই অভিপ্রেত হয়। ইহার উদাহরণ এই—পূর্ব্বে নীহারের একটী কাঁটা ফুটিলে আমার প্রাণ অস্থির হইত, কিন্তু সে দিন তাহার ভয়ানক উরুস্তম্ভ হইয়াছিল, সে যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল, তথাচ আমি কামের বশীভূত হইয়া কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাই বলি, কাম নিজেরই সুখের ইচ্ছা, পরের প্রাণের সহিত যোগ করে না। আমার এইরূপ ভাব দেখিয়া নীহার আমাকে পদাঘাত করিয়াছিল। আমি তখন অপমান জ্ঞান করি নাই, বেদনা অনুভব করি নাই। তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে সে ক্রোধে আমাকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়াছিল। তাই বলি, কামে বশীভূত হইলে পরের প্রাণ আনিয়া যোগ করা দূরে থাকুক, আপনার ইন্দ্রিয় ও আত্মা আপনার থাকে না। আমি তেজীয়ান্, নীহারকে অবশ করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলাম। প্রাণাংশ বীর্য্যকে বার না করিয়া দিলে কাম ক্ষান্ত হয় না। বীর্য্যনাশ হইলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় কার? যাকে কাম দগ্ধ করিয়াছে। মরিতে ইচ্ছা হয় কার? আত্মার। যে কাম বীর্য্য বাহির করিয়া দেয়, তাহার কি মরিতে ইচ্ছা হয়? না। তবে কাম আত্মা নয়, আত্মার শত্রু। তাহার প্রমাণ আত্মগ্লানি।

গিরিচূড়াবলম্বী অনীল এই রূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। এ দিকে গিরির পাদদেশে কতকগুলি কোলের নরনারী আমোদে আমোদিত। তাহাদের একটী পুরুষ মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। অনেকগুলি রমণী তালে তালে পা ফেলিতেছে। তাহাদের মস্তকে ফুল নড়িতেছে। নাচিতে নাচিতে তাহারা গীত গাইতেছে। অনেকগুলি কোল চীৎকার করিয়া তাহাদের প্রশংসা করিতেছে। মৌলফলের মদ খাইয়া সকলেই উন্মত্ত। অনীল বধির। এ আমোদ তিনি জ্ঞাত নহেন। আর বাঁচিয়া কাজ কি? বলিয়া তিনি উচ্চ গিরি হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

ইহাতে কোলদের গীত বন্ধ হইল। জ্যোৎস্নালোকে অনীলকে পড়িতে দেখিয়া তাহারা নীচে পড়িতে দিল না। গিরি হইতে গড়াইয়া পড়াতে অনীলের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। রক্তরঞ্জিত অনীলকে কোলে লইয়া একজন কোল নীহারের ঘরে রাখিয়া আসিল।

এখানে বলা আবশ্যক, যে দিন হইতে অনীল কামদ্বেষী হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে নীহারের চক্ষুর বিষ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বিপদে নীহার দুঃখিতা না হইয়া বরং অতি সুখিনী হইলেন। তিনি অনীলকে তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন ও রোগে ঔষধ দিতে একেবারে বঞ্চিত করিলেন। নীহার গৃহে থাকিতেন না, কেবল গিরির উপরি উঠিয়া বেড়াইতেন। তিনি কোন নগরে কিংবা পল্লীতে যাইবার ইচ্ছা করিলে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, নগর বা পল্লী এই স্থান হইতে অনেক দূরে ছিল। গিরিচূড় হইতে অনেক দূর দেখিয়া তিনি বিহঙ্গিনীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন মিলন।

দিনে দিনে অনীলের রোগ বৃদ্ধি হইল, শরীর দ্বিগুণ ফুলিল। তাহার স্থানে স্থানে পুঁয রক্ত ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। কুটীর দুর্গন্ধময় হইল। নীহার সুখে থাইতে পান না, ঘরে তিষ্ঠিতে পারেন না, শেষে জ্বালাতন হইয়া অদ্য প্রাতঃকালে বৃদ্ধার সাহায্যে অনীলকে ধরিয়া তরুশূন্য প্রস্তরময় স্থানে ফেলিয়া আসিলেন। বৃদ্ধা ঘর পরিষ্কার করিয়া নূতন শয্যা বিছা-

ইল। সুগন্ধ দ্রব্য ঘরময় ছড়াইয়া তাহা গন্ধপূর্ণ করিল। নীহার অনেক দিনের পর শয্যায় গা ঢালিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তিনি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন এবং শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বনমধ্যে চলিলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, বন্য পশুরা ইতস্ততঃ দৌড়িয়া পলাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিতে দেখিতে তিনি বন্য ক্ষুদ্র প্রবাহিণীতীরে পঁহুছিলেন এবং দেখিলেন, প্রবাহিণী পূর্ণ হইয়া দৌড়িতেছে। তিনি ভাবিলেন, দূরস্থ বনে জল হইয়াছে। এই সময়ে এক পাল হরিণশিশু জলে লম্ফ দিয়া পড়িল। নীহার শশব্যস্ত হইয়া একটীকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া অঞ্চল দিয়া তাহার গা মুছাইতে ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই কালে কয়েকটা শিকারী কুকুর আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল। নীহার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী মহম্মদীয় প্রধান সৈনিক পুরুষ নীহারের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কুকুরগুলাকে তাড়াইলেন। সৈনিক নীহারের মুখের পানে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। নীহারের চক্ষু আবেশে নত হইল। সৈনিকের অনেকগুলি সঙ্গী সেই খালের অপর পার্শ্বে জুটিল। অশ্বারোহী ব্যক্তি সকলকে হুকুম করিলেন, আজি মৃগয়া বন্ধ করিয়া তোমরা সকলে তাম্বুতে যাও। ইহা শুনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি শিকার স্কন্ধে করিয়া কুকুরের দল ডাকিয়া লইয়া তাম্বুতে চলিয়া গেল। নীহার মরালগমনে স্বীয় কুটীরের দিকে চলিলেন। কুরূপ কুগঠন কাফরীর অনুরূপ মহম্মদীয় সেই সৈনিক পুরুষ বনমানুষের চলনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তৎপরে উভয়ে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সচ্চরিত্রতার পুরস্কার।

বৈশাখীয় দ্বিপ্রহরে ক্রোধশালী মার্ত্তণ্ডদেব স্বীয় কর দ্বারা ধরাকে আক্রমণ করিয়া কাঁপিতেছে। রৌদ্র ছুটাছুটি করিতে করিতে জলাশয় হইতে জল লইয়া আকাশে উঠিতেছে। বন্য পশুরা ঝরণার জলে স্নান করিয়া হৃদয়ের তাপ অপনীত করিতেছে। সংসারে যেন আগুন লাগিয়াছে। জন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতিরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। গিরিপদতলে তপ্ত শিলাতলে অনীল শয়ান। এই স্থানে বৃক্ষের নামমাত্র নাই। এই সময়ে উত্তর দিকের কুটীরে নীহার ও একজন আসমাননামক মহম্মদীয় যুবক রজ্জুনির্ম্মিত গদীসজ্জিত একখানি খাটের উপরি বসিয়া নাচনতালে গীতের ঝঙ্কার দিতেছেন। একজন বৃদ্ধা বড় একখানা পাখা লইয়া বীজন করিতেছে। যুবক ও নীহার পূর্ব্বপশ্চিম দিকে মুখামুখী হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে আলবোলা, গোলাপদানী, রেকাবে বেদানা, পানফল, পেস্তা প্রভৃতি সুমিষ্ট সুফল ও বড় বড় গেলাসে সুশীতল বিলাতী জল রহিয়াছে। নীহার আসমানের মুখের দিকে চাইয়া চাইয়া মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে গীত গাইতেছেন। আসমান তবলায় সাইত করিতেছেন এবং এক এক বার সকামে তাঁহার চিবুক ধরিয়া তাঁহাকে সোহাগ করিতেছেন।

তপ্তশিলোপরি শয়ান মৃতকল্প অনীল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি-

তেছেন। গিরি হইতে পতিত হওয়াতে তদীয় সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছে এবং তাহা হইতে অনবরত পূয ও রক্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই। তিনি তৃষ্ণায় হাপাইতে হাপাইতে, একটু জল দেও, একটু জল দেও, বলিয়া চেঁচাইতেছেন। আমোদাসক্তা নীহার তাহার কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না এবং অনীলকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অনীল এক বার নির্ব্বাক্ হইয়া অতি কষ্টে শয়নাবস্থায় গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তরপার্শ্বস্থ কুটীরের দিকে চাইয়া রহিলেন। তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। উত্তরে তাঁহার মস্তক ও দক্ষিণে পদ রহিয়াছে। তিনি এই অবস্থায় নিরন্তর জল প্রার্থনা ও চীৎকার করিতে লাগিলেন। তদীয় চীৎকারে নীহারের গীত বন্ধ হইয়া গেল। অনীলের এই শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদের উভয়ের আমোদজনক হইল। নীহার হাসিয়া আসমানকে বলিলেন, দেখ, এ কেমন করিয়া চাইয়া আছে। আসমান বলিলেন, বিবি! ইহার মনস্তাপ জন্মিয়াছে, ইচ্ছা যে তোমার কাছে আসিয়া মজা করে। নীহার হাসিয়া উঠিলেন এবং যুবকের মুখের দিকে চাইয়া নাচানতালে গীত ধরিলেন—

মন আমার ছিল ভাঁড়ারে।
তালা ভেঙে সাঁদি যাদু নিয়েছ তুড়ে॥
দেশে পাল্ সিঁয়ে এড়া, ন্যায়, ধৈর্য্যে দিনু বেড়া,
অকস্মাৎ বেড়া ভেঙে প্রাণ খেলে ষাঁড়ে॥

অনীল আর উক্তরূপ দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না এবং উর্দ্ধদিকে (প্রখর সূর্য্যের দিকে) দৃষ্টি রাখিলেন। তদীয় চক্ষু হইতে জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। সূর্য্য সেই ভাবে রহিল। কে বলে সূর্য্য দেবতা? অনীলের দৃষ্টি অন্ধকারময়ী হইল। নিশ্বাস প্রবলবেগে বহিতেছে বলিয়া তাঁহার শরীরে জীবন আছে বলিয়া বোধ হইল। বেলা অপরাহ্নে তিনি চমকিয়া চাইয়া দেখিলেন, নীহার অপহরণ করিবার নিমিত্ত

তাঁহার বাহুস্থিত বহুমূল্য স্বর্ণনির্ম্মিত অনন্তে হাত দিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন এবং চীৎকার করিতে করিতে গড়াইতে লাগিলেন। তিনি আর নীহারকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, পরকালে আসিয়াছি, পৃথিবীতে যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, যমদূত সেই সকল পাপের দণ্ডস্বরূপ এত যন্ত্রণা দিতেছে। এ যন্ত্রণা আমাকে কি চির কাল ভুগিতে হইবে? ইহা বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

তিনি আবার চিন্তা করিলেন, কাহাকে ডাকিলে আমার এ যন্ত্রণার নিবারণ হইবে? হায়! আমার ডাকিবার লোক নাই, যন্ত্রণা নিবারণ করিবার লোক নাই। এ রাজ্য দয়াময়ের নয়, সয়তানের। তৎপরে তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

বুড়ীর মাথায় একটা মোট চাপাইয়া দিয়া নীহার, আসমানের সহিত কুটীর ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা আসিল। এই সময়ে অনীলের কাছে কেহই নাই। তিনি একাকী অচেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করিয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। শবভুকেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া কোলাহল করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে জীবিত ভাবিয়া খাইতে সহসা সাহসী হইল না। এমন সময়ে পশ্চিম দিকে তিন জন সাঁওতালের গীত শুনা গেল——

ছেড়্‌ব না তেরে উদাম্ শাড়ীইইইই।
এএএএ যে বলে সে বোলুক্ লেকে, আমি ত ছেড়্‌বে না তেকে,
তের নেগে হবো গুণাকারীইইইই।
কেতনা পেরাবো শেঁকে শাড়ীইইইই।

এই গীতশব্দ শুনিয়া শবভুক্‌দের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল। গায়কদের হস্তে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, কাঁধে তীরপূর্ণ তূণ ও কাঁড়বাঁশ এবং কর্ণে মোটা মোটা সোনার মাকড়ী। তাহারা শিকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অনীলকে দেখিতে পাইল। অনীলের দিকে চাইয়া চাইয়া এক-

জন অপরকে বলিল, আমি ইহার দেশে খাটিতে গিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি আমাকে একখানা কাপড় দিয়াছিল। ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি বলিল, এ ব্যক্তি আমাকেও এক দিন পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছিল। এ বড় ভাল মানুষ। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, সে দিন আমার ব্যায়রামে ঔষধ দিয়া এ ব্যক্তি আমাকে আরাম করিয়াছিল। এ বড় ভাল লোক। ইহা বলিয়া তাহারা তিন জনে অনীলকে স্কন্ধে করিয়া আপনাদের দূরস্থিত দক্ষিণ দিকের কুটীরে লইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাস।

নীহার আসমানের সহিত অসংখ্য তাম্বুর মধ্যে একটি তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। তাম্বুর পশ্চিমে নিকুঞ্জবন ও অপর তিন দিকে গিরিশ্রেণী। অপরাহ্নে কিরণমালা গিরিচূড়া ও নিকুঞ্জের শিরদেশ হাসাইতেছে। তৎপরে সন্ধ্যাসমীরণ বহিতে লাগিল। এই সময়ে আসমানের অনুমতিক্রমে দাসেরা এক তাম্বু হইতে একটী টেবিল আনিয়া এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে কতকগুলি চেয়ার স্থাপিত করিল এবং তদুপরি সুপক্ক মৎস্য, মাংস, সুমিষ্ট সুপক্ক ফল, নয়নানন্দ ফুলের তোড়া, সুরা, গেলাস রাখিয়া দিল। তৎপরে আসমান বিবীর হাত ধরিয়া দক্ষিণ মুখে ও নীহার উত্তর মুখে চেয়ারে বসিলেন। পাঠক! তুমি কেন দাঁড়াইয়া থাক? পশ্চিমদিকস্থ শূন্য চেয়ারখানির উপরি উপবেশন কর। দীর্ঘকৃষ্ণশ্মশ্রু কাফ্‌বীর সম্মুখে সুমুখী

সুরূপা নবযৌবনা গৌরবর্ণা উপবিষ্টা হওয়াতে, বোধ হইল, যেন বিকটরূপ দশাননের সম্মুখে ষোড়শী দেববালা, যেন কৃষ্ণবর্ণ তমাল বৃক্ষের সম্মুখে স্বর্ণলতা অবস্থিতা। তৎপরে বোতলের ছিপী খোলা হইল। নীহার সুরাপূর্ণ গেলাস ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—

খাই নি কখন, না খেলে নয়, কাম্ কামানের হুক্।
পেটের ভিতর এসো দিদি! লাল টুক্ টুক্ টুক্॥

সাহেব! এ বার তুমি খাও খাও, যদি না খাও আমার মাথা খাও। আসমান সুরা পান করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, যেন ঝোপের ভিতর তরঙ্গিণী যাইল, যেন মহাদেবের জটার ভিতর গঙ্গা প্রবিষ্ট হইল। আসমানের হা দেখিয়া নীহার হাসিয়া বলিলেন—

ঝোপের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝকে।
হৃদিপদ্মে পদ্মনাভ বোসে বোসে বকে॥

সাহেব বিবীর মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে ঝোপ দুলাইয়া দুলাইয়া দাঁত মুখ খেচাইয়া গীত ধরিলেন—

জেনেছি তোই, বেসবতী সই! এতো রেজের পর।
খোদার কিরে বিবি! তোরে ভেবিস না পেরাণ! পর॥
মক্কা মহম্মদের জমীন্, দীন্ সুখে কাটাব দিন্,
বাছুর মুরগীর খানায় মজা, কাফের অথপার॥

আসমানের ভঙ্গী দেখিয়া বিবী হাসিয়া বলিলেন—

মূক মোক্তারী করে, খোঁড়া হয় ডাকপিয়াদা।
রোগা—ঘোড়া হাতী মারে, খেলে পরে জ্যায়াদা॥

তৎপরে আসমান নীহারকে বলিলেন, আমি হেঁদুর মেয়ের অনেক গীত শুনিয়াছি, কিন্তু কখন শ্লোক শুনি নাই। বিবি! তুমি শ্লোক বল, শুনি। বিবী সাহেবের কথা রক্ষা করিবার জন্য অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে চোখে তাল রাখিতে রাখিতে সানন্দে শ্লোক বলিতে লাগিলেন—

অনুগত তোমার যাদু! যাদু করেছো,
আমায় পাগল বানিয়েছো।
মন্মথ হোয়ে মন্ মথ হে! মনকে ঘেরেছো,
আমার প্রাণকে টেনেছো॥
অসহ্য তোমার বাণ, সেই জন্য তব স্মরণ,
নিবারণ হও প্রাণ! প্রাণ দহিছো,
আমার জীবন দহিছো॥

শ্লোক শুনিয়া সাহেবের মন প্রফুল্ল হইল না দেখিয়া বিবীর প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান হইয়া গেল। তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মর্ম্মভেদিনী দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাইয়া রহিলেন। সাহেব বলিলেন, বিবি! এ শ্লোকটী আমার মন হরণ করিতে পারিল না, তুমি আর একটা ভাল দেখে বল। নীহার ক্ষণ কাল ভাবিয়া স্বাধীনচেতা কবির ন্যায় সাহেবের দিকে চাইয়া পুষ্পভঙ্গীতে বলিলেন—

যাদু!
চোখের মাঝে দীঘী আছে, জলহরি তার মাঝ্খানে,
কোঠাবাড়ী তার মাঝ্খানে॥
বারাণ্ডাতে চেয়ার পেড়ে, বোস প্রাণনাথ! সেইখানে,
ধরি তোমার চরণে॥

সেথায়
প্রেমফুল কামিনী একটী, চির কাল রয়েছে ফুটি,
সৌরভ করে ছুটাছুটী, বাতাস খাব আমরা সেথায়
বোসে প্রাণনাথ! দুজনে॥

আর সেখানে
দোলায়ে দুলায়ে টলায়ে চরণ, খেম্টার তালে নাঁচে জীবন,
চল সেথায় যাই জীবনধন! নাঁচ দেখবে নয়নে,
ফেরী দিবে সঘনে॥

ইহা শুনিয়া সাহেব অসন্তুষ্টের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহাতে বিবীর মনোবেদনা দিতে পারিলেন না। বিবী সাহেবের মুখের দিকে হাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন—

যে পেয়েছি দেড়ে গোসাই, কেন নবদ্বীপ যাব?
যে পেয়েছি পোষা ভালুক, ঘরে বোসে নাচাব॥
যে পেয়েছি কেঁদো বাঘ, দিন্ মাংসের হবে পারণা,
পেয়ার পেরাণের উল্লুক! থুরুক্ থুরুক্ নাচনা॥

এই মনোহর শ্লোক শুনিয়া সাহেব আহ্লাদে ঘোড়ার ন্যায় শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিবীকে ধন্যবাদ দিলেন। বিবী আবার বলিলেন—

নারকুল গাছে ডাব ফলেছে,
বাঁদর কামড়ে মরে।
ফুলবাগিচায় চাষা বেড়ায়,
কোঁদাল কাঁধে করে॥
রাম হয়েছে কালীর পাঁঠা,
মরকট রক্ষাকর্ত্তা।
পদ্মবনে ভোমরা ছাড়া,
করকোটে বেঙ বক্তা॥
রতির স্বামী কালা দৈত্য,
কামদেব গেছে মোরে।
রুয়ের চারে রুই নাইকো,
কচ্ছপ আসি চরে॥
নলের তক্তায় পুষ্কর বসে,
কুত্তো সিংহের গর্ত্তে।
বিক্র করে স্বর্গরাজ্য,
ইন্দ্র থাকে মর্ত্তে॥

এই শ্লোক বলিয়া বিবী প্রকৃতিস্থা হইলে তদীয় প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখি-

ছেছি? এবং আসমানের মুখের দিকে চাইয়া চিক্কা তুলিয়া গেলেন। সাহেব বিবীর শ্লোক শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—ooo—

নৈরাশ্য।

আষাঢ়ের অপরাহ্ণে আকাশের ধারে ধারে থরে থরে জলদ-পর্ব্বতগুলি দণ্ডায়মান। তাহার মধ্যস্থলটী মেঘশূন্য হইয়া অস্ত-গামী সূর্য্যরশ্মিতে রঞ্জিত। প্রান্তস্থিত জলদপর্ব্বতগুলিতে সুর-নর্ত্তকীরা যেন লুকাচুরী খেলিতেছে। ময়দান শ্বেত জলে গা ডুবাইয়া রহিয়াছে। জীবনবাসী জীবগণ নববারিসমাগমে আহ্লাদিত হইয়া দৌড়িতেছে। এই সময়ে দুই এক খানি ক্ষেত্র যেন সবুজের ওড়না গায়ে দিয়া বায়ুতরঙ্গে খেলিতেছে। ক্ষেত্রের চারি পার্শ্বের ভূমিগুলিতে শম্বুকেরা ডিম্ব প্রসব করাতে যেন রৌপ্যখণ্ড সকল শোভা পাইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিবর্গ পলায়িত পতঙ্গ ধরিয়া খাইতেছে এবং আনন্দে মধুর ধ্বনি করিতেছে। এই সময়ে শীর্ণবিবর্ণকায়া নীলিমা ছাদের উপরি দাঁড়াইয়া বৎসরের এই নূতন ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তিনি নিবিষ্ট মনে দেখিবার চেষ্টা করিলেও তদীয় চক্ষু স্থির হই-তেছে না। তৎপরে তাঁহার দৃষ্টি নদীহৃদয়ে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, পানশী বজরা প্রভৃতি জলযান সকল নদীহৃদয়ে যাতায়াত করিতেছে এবং শুনিলেন, কোন পানশী হইতে গীতের ঝঙ্কার হইতেছে। এই সময়ে একখানি পানশী গঙ্গে উপস্থিত হইল। তাহার যাত্রীরা তীরে নামিয়া নীলিমাদের বাটীর পশ্চিম

দিক্ দিয়া যাইতে লাগিল। যাত্রীদের মধ্যে সকলকেই নীলিমার দাদা বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না। অস্তগামী সূর্য্যদেবকে দেখিয়া নীলিমার হৃদয়পদ্ম ম্লান হইল। তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নদীর দিকে চাইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চক্ষুর জল তদীয় দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করাতে তিনি ক্রোধে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, পোড়ামুখ চোখের জল! এক বার থাম না, কিন্তু সে থামিম না। যখন সে থামিল, তখন অন্ধকার জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। নীলিমা দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ক্ষণ কাল পরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাহকেরা একখান শিবিকা আনিয়া নীলিমাদের গোলাবাড়ীর সম্মুখে রাখিল। তাহা দেখিয়া বালিকা আহ্লাদে ছাত হইতে নামিয়া যানস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া দাদা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যানস্থ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, পোড়ামুখি! কে তোর সলীল দাদা? খেপিয়াছিস্ না কি? তখন বালিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার মণী দিদী এই উত্তর করিতেছেন। মণী দিদীর অঙ্কে মুখ লুকাইয়া বালিকা কাঁদিলেন। দিদী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, নীলি! তুই কাঁদিস্ কেন? আমাকে ছেড়ে দে, আমি উঠে যাই।

নীলিমা। আমার দাদা কত দূরে আসিতেছেন? বল।

মণী। তুই আমার কোল হইতে উঠ্। আমি তোর ঠাকুর-দাদার খপর আনি নাই।

নীলিমা গম্ভীর হৃদয়ে কোল হইতে উঠিলে মণী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নীলিমা অনীলের শয়নগৃহে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বসিলেন। যে তাকিয়াটী দাদা মাথায় দিতেন, তাহা তিনি যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন এবং একটী লম্বা বালিশকে দাদার ন্যায় শয়ন করা-

ইলেন। চাদর দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া তিনি তৎপার্শ্বে বসিয়া দাদাজ্ঞানে বলিলেন, দাদা! যে মণী দিদী আমাকে শ্লোক শিখান, তিনি আজি এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার একটী শ্লোক বলি শুন।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ পড়ে বৃষ্টি, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে উইচিংড়ে।
হুড় হুড় হুড়, গুড় গুড় গুড়, চড় চড় মেঘ ডাক ছাড়ে॥
চক্ চক্ চক্ চকে সৌদা, জলদের কোল চিকুরে।
কড় কড় করে বেঙ হাঁকারে, মক্ মকে মুখ হা করে।
থর্ থর্ থর্ থরে পাতা, সন্ সন্ সন্ বাত দৌড়ে।
ধিক্ ধিক্ তার মরণ ভাল, এমন সময় যে পুড়ে॥

এটী কেমন দাদা! বালিশ কোন উত্তর করিল না। উত্তর না পাইয়া বালিকা বলিতে লাগিলেন, আমি বলিতে জানি না বলিয়া তুমি কি রাগ করিয়াছ? যাহাকে তুমি ভাল বাস, তাহার প্রতি রাগ কর কেন?

এই সময়ে কে ডাকিল, নীলি! তুই কাঁদিতেছিস্ কেন? এ রোগ তোর কবে থেকে হয়েছে? এ কথার কোন উত্তর না করিয়া নীলিমা দিদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দিদি! তোমার পায়ে ধরি, বল না, দাদার সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল?

মণী। আমি! ঠাকুরদাদা নাইট্ স্কুলের মাষ্টার হইয়াছেন। তুমি কিছু কি খপর রাখ না? তিনি দুদিন আমাকে পড়াতে এসেছিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের পোড়ার মুখ দেখে আমি পড়ি নাই। আমি ইহা ভিন্ন অন্য কিছু জানি না, যদি জানি, তবে মরিলে যেন গঙ্গা না পাই।

নীলিমা। আমি তোমার কথার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দাদা কেমন আছেন, কি বলিয়াছেন, কবে আসিবেন, এই সকল তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

মণী। আয়, তুই এখন উঠে আয়। আজি কয়েক জন তোকে দেখিতে আসিয়াছেন। তোকে গহনা পরিয়া দেখা

দিতে হইবে। যাঁহার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হইতেছে, তাঁহার রাজধানী আছে। এবার তুই রাজরাণী হইবি।

ইহা শুনিয়া নীলিমা চমকিয়া উঠিলেন।

মণী। বিয়ের কথা শুনেই চমকাইলে চলিবে কেন?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

কামের প্রভাব।

কুড়মীদের যত্নে অনীল সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন এবং অদ্য প্রাতঃকালে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি রাস্তা জানেন না, সুতরাং অসভ্য কুড়মীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় কখন প্রফুল্ল, কখন বা উৎসাহের তরঙ্গে আলোড়িত, কখন বা উপকারীর স্নেহের সুশীতল ভক্তিরূপ শান্তিজলে পূর্ণ, কখন বা নারীজাতির নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত এবং কখন বা প্রকৃত সুখ দুঃখ চিন্তায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইতেছিল। তিনি প্রখর রৌদ্রে তাপিত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় তাপ অপনীত হইলে ভাবিলেন, তরু স্বয়ং শীতল বলিয়া আমাকেও শীতল করিল, সূর্য্য নিজে অগ্নিময় বলিয়া আমার গাত্রে অগ্নি ঢালিতেছিল। আজি আমি সুখী বলিয়া কত সুখের পদার্থে আরোহণ করিতেছি। আমি তরুর কাছে জানিলাম, যে নিজে সুখী, সে পরকে সুখী করিতে পারে, অন্যকে সুখী করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার কাছে কোন স্বার্থ পাইবার আশা থাকে না, স্বার্থ যদি না থাকিল, পরের কাছে

কোন প্রত্যাশা রহিল না, প্রত্যাশা যদি না রহিল, তাহা হইলে মন পবিত্র হইল, মন পবিত্র ভাবে থাকিলে স্বাধীন। আজি অবধি আমি এই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। ক্রমে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। অতঃপর প্রান্তরে পড়িতে হইবে বলিয়া অনীল অগত্যা গৃহানুসন্ধানে চলিলেন এবং অনেক সন্ধানের পর একটী বাটী দেখিতে পাইলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া গৃহস্বামীকে রাত্রিবাসের জন্য অনুনয় করিলেন। গৃহস্বামী তদীয় অনুনয় রক্ষা করিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান, প্রসিদ্ধ ভূস্বামী, অতিথিসেবার নিমিত্ত একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আমীনকে অনুমতি করিলেন। আমীন অনীলকে অতিথিশালায় লইয়া গিয়া তাঁহার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। অনীল পাক করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক বৃদ্ধা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু! আপনি আমাকে কি চিনেন? অনীল দীপালোকে তাহাকে দেখিয়া ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, তুই সেই রাক্ষসীর সহচরী? ইহা বলিলে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল ও গাত্র কাঁপিতে লাগিল।

বৃদ্ধা। যাঁকে আপনি রাক্ষসী বলিলেন, তিনি আপনার জন্য দিবারাত্রি কাঁদিতেছেন। আপনাকে ছাড়িয়া আসা অবধি তাঁহার আহার নিদ্রা নাই। তিনি নিজের দুষ্কর্ম্ম ভাবিয়া কত বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু আমি বাধা দেওয়াতে তাহা করিতে পারেন নাই। বাবু! আজি তিনি আপনাকে হঠাৎ দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আপনি এ বিষয়ে কি আজ্ঞা করেন?

অনীল। আমি তাহাকে যমের বাড়ী যাইতে আজ্ঞা করিতেছি।

বৃদ্ধা। আপনি যা ইচ্ছা তাই বলুন, নীহার আজি আপনার পদসেবা করিতে কখনই ছাড়িবেন না।

অনীল ইহা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া বৃদ্ধাকে গলে ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা কোন কথা বলিল না। তৎপরে তিনি চুল্লীর আগুন নিবাইলেন। পাছে আবার বৃদ্ধা আসে, প্রলোভন দেখায়, দুষ্ট কাম মনকে ঘেরিয়া ফেলে, এই ভয়ে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কপাট বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক বার তাঁহার মনে রন্ধন করিয়া আহার করিবার ইচ্ছা হইল, আবার হঠাৎ ভয় হইল, উদর শান্ত হইলে পাছে পাশব বৃত্তি উত্তেজিত হয়। তিনি আহার না করাই স্থির করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু ভয়ে ও ক্ষুধায় তাঁহার নিদ্রা হইল না।

বৃদ্ধা নীহারকে স্বীয় অপমানের কথা জানাইলে, নীহার তাহাকে একছড়া স্বর্ণহার দিয়া তদীয় দুঃখ নিবারণ করিলেন এবং তাহার পা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, আয়ি! তুমি যদি এ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অনেক ধন দিয়া তুষ্ট করিব। বৃদ্ধা নীহারকে কিছু খাদ্য দ্রব্য দিতে বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তম খাদ্য দ্রব্য রেকাবে সাজাইয়া তাহার হস্তে দিলেন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে অতিথিশালায় যাইয়া দেখিল, অনীলের কবাট বন্ধ। তৎপরে সেই ভাণ্ডারীর কাছে গিয়া ইহার আদ্যোপান্ত বলিল এবং অর্থ দ্বারা ভাণ্ডারীকে হাত করিয়া তাহার সহিত অনীলের শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল। ভাণ্ডারী অনীলকে ডাকিল, অতিথ! কি জন্য তুমি রন্ধনে ক্ষান্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ? দ্বার খোল, যদি বাঁধিতে কষ্ট বিবেচনা করিয়া থাক, জল খাবার আনিয়া দিতেছি। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া অনীল দ্বার খুলিলেন এবং ভাণ্ডারি-দত্ত খাদ্য দ্রব্য ঘরে বসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আহার করিলেন। এই সময়ে ভাণ্ডারী ধীরে ধীরে তাঁহার কানের কাছে বলিল,—সাহেবকে আপনার কোন ভয় নাই। সমস্ত চাকর চাকরাণী বিবীর বশীভূত আছে, সুতরাং আপনি সচ্ছন্দে

এইখানে বিবীর সহিত রাত কাটাইতে পারেন। একণে সাহেব অন্য বিবীকে লইয়া তোষাখানায় আমোদে রহিয়াছেন। বিবীর এরূপ ক্ষমতা আছে যে, তিনি অনায়াসে সাহেবকে তাড়াইয়া দিলেও দিতে পারেন। ভাণ্ডারী যে ভাবে এই কথা-গুলি বলিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অনীল কম্পিত স্বরে বলিলেন, আমি তোমাকে প্রকৃত যমদূত দেখি-তেছি। তুমি এই ঘর হইতে বাহিরে যাও। ভাণ্ডারী ঘর হইতে বাহিরে আসিলে অনীল ঘর বন্ধ ও শয়ন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, জগদীশ! পুত্রকে এ ঘোর বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন, রাত যেন নির্বিঘ্নে পোহাইয়া যায়। এই সময়ে এক জন ভণ্ড বৈরাগী আসিয়া কবাটে ঠেলা মারিয়া বলিল, অতিথি! কবাট খোল, আমার কাছে উত্তরগীতা আছে, আমি পড়িব, তুমি শুনিবে, যে গরম, নিদ্রা ত হইবে না। অনীল সাধু-সমাগম জানিয়া আনন্দে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বৈরাগী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর-গীতা না পড়িয়া গোপীবিহারের শ্লোক পড়িতে লাগিল। অনীল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুস্তক ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পুস্তক লইয়া বৈরাগী বলিল, তুমি পুস্তক ফেলিয়া দিলে কেন?

অনীল। এ পুস্তক তোমার নিকটে রাখিবার যোগ্য নয়। ইহা নারকীর নিকটে থাকা উচিত। ইহাতে কেবল নিকৃষ্ট দুষ্ট কামের বর্ণনা আছে।

বৈরাগী। গোপীরা ঈশ্বরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। প্রেম না হইলে সন্তান হয় না, স্বর্গ হয় না, অধিক কি, সৃষ্টি হয় না। আপনি প্রেমের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, কিন্তু প্রেমের উপরি রাগ করিলে মহাপাপ। যাহা ঈশ্বরের প্রিয়, তাহা কপ-নই নিকৃষ্ট নহে।

ইহা শুনিয়া অনীল ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, কামপ্রিয়

ঈশ্বরকে কোটী কোটী বার পদাঘাত করি। যে কামকে প্রেম বলে, তাহাকেও—— এই কথা বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

এই সময়ে কয়েকজন মীর অনীলকে ঘেরিয়া বসিল। তাহাদের মধ্যে জনৈক গর্জ্জিয়া বলিল, বিবীর আজ্ঞা রক্ষা না করিলে তোমাকে অবিলম্বে যমালয়ে পাঠাইব। এই কথা শুনিয়া অনীল হাসিয়া বলিলেন, তাহাতে আমি দুঃখিত নই, বরং আহ্লাদিত। তুমি এ কার্য্যে বিলম্ব করিও না। বৃদ্ধা কানে কানে সকলকে কি বলিল। সকলে গৃহ হইতে অপসৃত হইলে নীহার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বার হইতে দ্বারে শীকল দিল এবং দাস দাসীদিগকে আসিয়া বলিল, বিবী তোমাদিগকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। তাহারা বৃদ্ধার কথা শিরোধার্য্য করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

অনীল নীহারকে কাছে আসিতে দেখিয়া পদাঘাত করিলেন। নীহার তাহাতে বেদনা অনুভব না করিয়া অনীলের সমক্ষে বসিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক চুল খুলিয়া বাঁধিতে লাগিলেন এবং দাঁড়াইয়া নির্লজ্জ ভাবে বসন খুলিয়া পরিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি তাঁহার বসন ভাল করিয়া পরা হইল না। ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অনীলের ধৈর্য্য লুপ্ত হইল। তিনি তীরবৎ উঠিয়া নীহারকে ধরিলেন। এই সময়ে আসমান গৃহের শীকল খুলিলেন এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অনীলকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া নীহার ভয়ে পলাইলেন। ভয়ঙ্কর প্রহারে অনীলের চৈতন্য লুপ্ত হইল। গৃহস্বামী আসমান দুইজন চাকরকে বলিলেন, তোমরা ইহাকে অবিলম্বে মহাবনে ফেলিয়া আইস। ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ অনীলকে স্কন্ধে তুলিয়া দূরস্থ মহাবনে ফেলিয়া আসিল। বাহকদ্বয় গৃহে ফিরিয়া আসিতে না আসিতে মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল, ঝড় বহিতে লাগিল, বিদ্যুৎ চকিতে লাগিল, প্রথমে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, তৎপরে হু হু করিয়া

বৃষ্টি আসিল এবং এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেলে আকাশ মেঘশূন্য হইল। এই সময়ে অনীল তৃষ্ণার কষ্টে মুখ ব্যাদান করিতেছিলেন। বৃষ্টির জীবন তদীয় শুষ্ক কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে তিনি নব জীবন পাইলেন এবং সঙ্গা পাইয়া অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে তাঁহার মনে হিংস্র জন্তুর ভয় হইল। তিনি স্থানান্তরে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীরে শক্তি ও বাহুতে বল না থাকাতে এবং একটা পদ ভগ্ন হওয়াতে তিনি দুই দশ হাত হামাগুড়ি দেন আর এক এক বার নির্জীব হইয়া শুইয়া পড়েন। এই রূপে সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া তিনি একটী পথের পার্শ্বে মৃতের ন্যায় পতিত রহিলেন। এই সময়ে তিনি বন অতিক্রম করিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—ooo—

প্রেম।

বেলা দুই দণ্ড হইলে লালু চৌকিদার থানায় সংবাদ দিল, কে, এক ব্যক্তিকে মারিয়া রাস্তার ধারে ফেলিয়া গিয়াছে। দলবল লইয়া দারোগা লাসের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং নিমৃখুন স্থির করিয়া চৌকিদারদিগের স্কন্ধে অনীলকে থানায় চালান দিলেন। দারোগা দোষীকে ধরিবার নিমিত্ত গ্রামগুলিকে তোলপাড় করিতে লাগিলেন এবং সন্দেহ করিয়া অনেক লোককে প্রহার ও বন্ধন করিলেন। চৌকিদারেরা ক্লান্ত হইয়া লাসকে এক স্থানে নামাইল। তাহার বিপরীত দিকে এক খানা শিবিকা নামাইয়া বাহকেরা তাম্রকূট সেবন করিতেছিল। এই শোচনীয়

ব্যাপার অবলোকনে সকলেই নিযুক্ত। শিবিকারোহিণী লজ্জাবতী নাম্নী একটী যুবতী অনিমিষ লোচনে ইহা দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে যুবতীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুবারি ঘোরতর বেগে বহিতে লাগিল। যুবতী লাসবাহকদের মুখে শুনিলেন, মৃতকল্প ব্যক্তি ডাকাতদের সঙ্গী, কোন স্থানে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। গৃহস্বামী ইহাকে আহত করিয়া ফেলিয়া গেলে আমরা থানায় লইয়া যাইতেছি। ইহা শুনিয়া যুবতী একজন দাসীকে বলিলেন, পান্না! তুই আমাদের বেহারার সর্দ্দারকে ডাকিয়া আন। দাসী সর্দ্দারকে ডাকিয়া আনিলে সর্দ্দার বলিল, মা ঠাকরুণ! আমাকে কি আজ্ঞা করেন?

যুবতী। আজি যদি তোমরা আমাকে অমরগড়ে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিব।

সর্দ্দার আহ্লাদে পারিব বলিয়া সঙ্গিগণকে ইহা জানাইল। তৎক্ষণাৎ বাহকগণ বুক বাঁধিয়া পাল্‌কী তীরবৎ চালাইল। পান্না সত্বর চলিতে না পারাতে যুবতী তাহাকে শিবিকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। দরওয়ান পারিতোষিক-লোভে শিবিকার অগ্রে অগ্রে ছুটিতেছিল। যুবতী এত ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পান্নার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এইরূপ হওয়াতে পান্না বলিল, আপনি এমন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন কেন?

লজ্জা। পান্না! আমি বিধবা, না সধবা?

পান্না। আপনার ত ছেলে বেলাই কপাল পুড়েছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

ইহা শুনিয়া লজ্জাবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং গাত্র কাঁপিয়া উঠিল।

তিনি ক্ষণ কাল পরে দাসীকে বলিলেন, আমি কাঁদি কেন পান্না?

পান্না। ইহা আপনার স্বভাব। আপনার কাঁদা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি না।

লজ্জা। ভাল পান্না! যাঁহার শিক্ষাতে আমি সকলরকম দোষ হইতে মুক্ত হইয়া জগতের জীবকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তিনি আমার কিপ্রকার পূজনীয়?

পান্না। তিনি ভগবানের ন্যায় আপনার পূজ্য ব্যক্তি।

ইহা শুনিয়া লজ্জা পান্নার গলা জড়াইয়া মুখচুম্বন করিলেন এবং পুনরায় তাহার মুখের দিকে চাইয়া বলিলেন, পূর্ব্বে আমি অমরগড়ে এক বিবাহ করিয়াছিলাম তাহা কি তুই জানিস না?

পান্না। সে ত অনীল বাবুর সঙ্গে। তিনি নীহারকে লইয়া কোথায় গিয়াছেন।

লজ্জা। ভাল পান্না! হিন্দুর মেয়ের কয় বিবাহ?

পান্না। জেনে শুনে এ কথা আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? এক।

ইহা শুনিয়া লজ্জাবতীর হৃদয় প্রফুল্ল হইল।

আড়াই প্রহর নিশাতে বাহকেরা বিশ্রামের নিমিত্ত এক অশ্বত্থতলে পাল্কি নামাইল এবং তামাক খাইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন যুবক, দুইজন সজ্জিত সৈনিক পুরুষের সহিত তাহাদের কাছে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, এ পাল্কী কার?

বাহকেরা। ভীমানাথদেবের কন্যার। তিনি সাজাহানগড়ে ভগ্নীর বাড়ী গিয়াছিলেন।

যুবক। ভীমানাথদেবের বাড়ী কোথায়?

বাহকেরা। রাজবেড়।

ইহা শুনিয়া যুবক সত্বর কোষ হইতে অসি বহির্গত করিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, ভীমানাথদেবের কন্যাকে পাল্‌কী হইতে বাহির করিয়া দে। সে আমাদের বধ্য। তোরা আমাদের বধ্য নহিস, যদি তাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিস্, তাহা হইলে আপন অস্ত্র বাহির কর। ইহা শুনিয়া বাহকেরা ও দরওয়ান কম্পান্বিত কলেবরে বলিল, হুজুর! আমরা আপনাদের চাকর।

আপনারা আমাদিগকে মারিলেও মারিতে পারেন, রাখিলেও রাখিতে পারেন। আমরা স্থানান্তরে পালিয়ে যাইতেছি। আপনারা যা ইচ্ছা তা করুন। তাহাদের এই নিষ্ঠুর কথা শুনিয়াও লজ্জাবতী নিশ্চলা। পান্না শিবিকা হইতে নামিয়া বনে লুকাইল। তৎপরে যুবক বাহকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীমানাথদেবকে বলিবে যে, তোমার নীহারের দূতী তদীয় কন্যাকে অনীলের বন্ধু প্রাণে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহা শুনিয়া লজ্জাবতীর হৃদয়ে শেল বাজিল। তিনি পাল্‌কী হইতে বাহির হইয়া নিষ্কম্প কলেবরে গম্ভীর বাক্যে বলিলেন, হাঁ, আমি পাপিনী! আপনাকে আমি ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আপনি আমাকে বিনাশ করুন। আমারই অসাবধানতার জন্য নীহার আপনার বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আপনি আমাকে শীঘ্র বিনাশ করিয়া আপনার বন্ধুর নিকটে যাউন। এক্ষণে তিনি মৃতকল্প। চৌকিদারেরা তাঁহাকে ডাকাতদের সঙ্গী ভাবিয়া বিলাসপুরের থানায় লইয়া যাইতেছে।

প্রসূন। এক্ষণে তিনি মৃতকল্প কেন?

লজ্জা। আমি তাহার বিশেষ কিছু জানি না।

ইহা শুনিয়া যুবক সৈনিকদ্বয়ের সমভিব্যাহারে লজ্জাবতীর নিকট হইতে শীঘ্র পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

চৌকিদারেরা অনীলকে কাঁধে করিয়া বিলাসপুরের থানায় লইয়া গেল। দারোগার যত্নে অনীল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন।

দারোগা তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রতি আমার পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে। বাপু! তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল, তোমার সঙ্গীদের নাম কি? আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে খালাস করিয়া দিব। অনীল সন্তপ্তহৃদয়ে বলিলেন, আমি রাণীপুরে আসমান নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে চুরী করিতে গিয়াছিলাম। আমার আর কেহ সঙ্গী নাই।

দারোগা। কেন বাবু! সঙ্গীদের নাম লুকাইতেছ?

অনীল দারোগার পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, আপনি পিতার তুল্য। আমি আপনার নিকটে সত্য বলিতেছি, আমার অন্য কোন সঙ্গী নাই।

ইহা শুনিয়া দারোগা ক্রোধে অনীলকে পদাঘাত করিলেন। অনীল মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কনষ্টবলেরা মূর্চ্ছা অপনীত করিলে দারোগা তাঁহাকে কোলে লইয়া বলিলেন, আর কেন বাপু! বৃদ্ধ পিতার ক্রোধ বৃদ্ধি কর? তুমি কি জান না, লোক বৃদ্ধ হইলে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার দৌরাত্ম্য মনে করিও না, সত্বর সঙ্গীদের নাম বলিয়া দেও এবং আমাকে অধিক কষ্ট দিও না।

অনীল। আমার সঙ্গী থাকিলে আমি আপনাকে অবশ্য বলিতাম। আপনি আর মিছা বাক্যব্যয় করিবেন না।

ইহা শুনিয়া দারোগা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কনষ্টবলগণকে হুকুম দিলেন, তোমরা ইহাকে অবিলম্বে গারদঘরে প্রবেশ করাইয়া লঙ্কার ধূঁয়া দেও। কনষ্টবলেরা অনীলকে গারদঘরে পূরিয়া বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কার ধূঁয়া দিল। ইহাতে তদীয় চক্ষু হইতে খরতর বেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাশিতে লাগিলেন এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দ্বাররক্ষককে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর প্রহরীর কঠিন অন্তঃকরণ তদীয় কাতরোক্তিতে দ্রবীভূত হইল না। সে

কর্কশভাবে তাঁহার প্রতি জঘন্য গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অনীল আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কে বলে, অনন্তদয়াময় অনন্তশক্তিশালী জগৎস্রষ্টা আছেন? তিনি থাকিলে সেই রাত্রিতে বিপদের ভয়ে গলায় কাপড় দিয়া তত ডাকিলেও আমাকে নিকৃষ্ট কামবৃত্তি হইতে রক্ষা করিলেন না কেন? এবং আমি পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আপনার মস্তকে কত বার মুষ্ট্যাঘাত করিলেও তিনি আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না কেন? হায়! এক্ষণে এত যন্ত্রণা পাইতেছি, তথাপি আত্মহত্যা করিবার কোন একটা উপায় দেখিতেছি না। হায়! দুষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইব বলিয়া পাহাড় হইতে পড়িলাম, তথাপি মরিলাম না। অনীল আর ভাবিতে না পারিয়া কাশিতে কাশিতে পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। দ্বারী তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া তদীয় মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। তৎপরে তাঁহাকে দারোগার কাছে লইয়া গেলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও তুমি সঙ্গীদের নাম বল, নতুবা আরো যন্ত্রণা পাইবে।

অনীল। আপনি যত শীঘ্র পারেন আমাকে বধ করুন, আর যন্ত্রণা দিবেন না।

অনীলের এই কথা শুনিয়া দারোগা নিশ্চয় জানিলেন, ইহার সঙ্গী নাই। তৎপরে তিনি ত্বরায় ঘোড়ায় চড়িয়া আসমানের গৃহে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি একজন চোরকে মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছেন, অথচ আমাদিগকে সংবাদ দেন নাই। আসমান দারোগাকে বসিতে বলিয়া অন্দরমহলে নীহারের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবি! যে গণক তোমার সতীত্ব হরণ করিবার ইচ্ছায় তোমাকে ছলে বলে আপনার ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছিল, সে এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বিলাস-পুরের থানার চোর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। দারোগাবাবু আমার হস্তগত থাকাতে আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। এক্ষণে তাহাকে খালাস দিব না জেলে দিব? নীহার মুহূর্ত্ত কাল

স্তব্ধ থাকিয়া ভাবিলেন, যদিও আমি অনীলকে পাই, তথাচ আমার আর অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ নির্ব্বোধ অনীল আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে কেন, কোন রমণীর সহিত আর সহবাস করিবে না। অনীল ঘরে যাইলে আমার কলঙ্ক দেশে দেশে গাইবে। সে বাঁচিয়া থাকিলে আমার অমঙ্গল এবং কয়েদে থাকিলে নিশ্চয় মরিবে। তাহা হইলে, আমার কলঙ্ক গাইবার লোক রহিল না। তৎপরে তিনি আসমানকে হাসিয়া বলিলেন, গণক ধূর্ত্ত ও বদমায়েস। আপনি তাহাকে কয়েদে দিউন। সে আমার কি কম সর্ব্বনাশ সাধিত? আপনার মঙ্গলকামনায় গণাইতে যাইয়া আমি কি ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলাম? নীহারের এই কথায় জ্ঞানী ভুলেন না, কিন্তু কামুক ভুলিয়া যায়। আসমান নীহারের অতি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং নীহারের আজ্ঞা শিরোধার্য্য এবং অর্থ দ্বারা দারোগাকে বশীভূত করিলেন। দারোগা আসমানকে তিন জন সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলে আসমান সাক্ষী লইয়া দারোগার সঙ্গে বিলাসপুরের থানায় উপস্থিত হইলেন।

তৎপরে দারোগা প্রভৃতি সকলেই অনীলকে সঙ্গে লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিচারপতি অনীলের বিনা আপত্তিতে অনীলকে দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——০০০——

কারাবাসক্লেশ।

জেলের একটী প্রশস্ত স্থানে এক দিন অনীলকে একটী ঘানিতে জুড়িয়া দিলে তিনি অতি কষ্টে তাহা টানিতে লাগি-

লেন। তিনি ঘানি টানিতে টানিতে এক বার থামিলে একজন প্রহরী তাঁহাকে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত করিল। তাহাতে তাঁহার গাত্রে ক্ষত হওয়াতে তাহা হইতে অনবরত রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে আবার ঘানি টানিতে লাগিলেন। এইরূপ করাতে অনীল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিনয়পূর্ব্বক প্রহরীকে বলিলেন, তুমি আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল, আমি আর টানিতে পারি না। ইহাতে প্রহরী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিতে ও পদাঘাত করিতে লাগিল। অসহ্য ক্লেশে অনীল মূর্চ্ছিত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন। প্রহরী অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছা দূর করিল। তৎ-পরে তিনি দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি এমন পাষণ্ড, এমন দুর্ভাগ্য যে, আমার ডাকি-বার একটী লোক নাই। আমি একটি স্ত্রীর নিমিত্ত পিতা, মাতা ও বন্ধুবর্গকে তুচ্ছ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ডাকিব কোন্ লজ্জায়? হায়! এক্ষণে আমার জীবনাকাশ অন্ধকার। ইহাতে একটীও তারা নাই যে, তাহাকে দেখিয়া শীতল হোই। যদি কেহ আমার উপাখ্যান লিখেন, তিনি যেন দেখাইয়া দেন যে, সহস্র লোক ভাল বাসিলেও আপনার হৃদয়ে ভালবাসা না থাকিলে, জীবন অন্ধকার। তিনি আরও যেন দেখাইয়া দেন, যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার হৃদয়াকাশের তারা হইয়া ফুটিয়াথাকে। হায়! আমার এই হতভাগ্য জীবন কি দুর্বহ পাপভার বহন করিতেছে এবং অন্ধ কূপেই বা কি করিয়া রহি-য়াছে? ইহা স্মরণ করিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তৎপরে প্রহরী আবার তাঁহাকে ঘানী গাছে জুড়িয়া দিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

কাতরা।

নীলিমার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইয়াছে। বিবাহের প্রফুল্লতার বিনিময়ে তদীয় মুখে মলিনতা জন্মিয়াছে। তাঁহার দেহখানি শুষ্ক, কেবল চক্ষু দুইটী স্ফীত। এই সময়ে যেমন ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, সেইরূপ তদীয় চক্ষু-মেঘ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুবারি ঝরিতেছে। বৃষ্টি যেরূপ ভবদেবীকে ভিজাইতেছে, নীলিমার অশ্রু সেইরূপ সলীলের শ্বেত শয়নীয় ভিজাইতেছে। নীল মেঘে যেমন বিদ্যুৎ চকিতেছে, সেইরূপ চক্ষুর জল মুছিবার সময়ে নীলিমার নীল চক্ষুতে বিদ্যুৎ চকিতেছে। মেঘের অভ্যন্তরে মেঘবাহন যেমন ডাক ছাড়িতেছে, নীলিমার বুকের ভিতর সেইরূপ প্রাণ-ইন্দ্র ডাক ছাড়িতেছে; তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ শুনিতে পাইতেছেন না। মেঘ ফাটিয়া বজ্র যেরূপ চড় চড় শব্দে ভূতলে পড়িতেছে, নীলিমার বুকে সেইরূপ শোকবজ্র চড় চড় করিতেছে, কিন্তু ফাটিয়া পড়িতেছে না, এইমাত্র প্রভেদ। বায়ুপ্রভাবে জগৎ যেমন হু হু করিতেছে, নিলীমার কানের ভিতরে সেইরূপ হু হু করিতেছে। মেঘে সূর্য্য যদ্রূপ লুক্কায়িত, অশ্রুজলে নিলীমার চোখের তারা তদ্রূপ লুক্কায়িত। বায়ুপ্রভাবে ধরণী যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, নৈরাশ্যঝড়ে নীলিমার দেহখানি সেইরূপ কাঁপিতেছে। ঝিঁ ঝিঁ স্বনে উইচিঙড়ারা যেরূপ কাঁদিতেছে, নীলিমার প্রাণ সেইরূপ বুকের ভিতর কাঁদিতেছে।

বালিকা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, দাদা! তুমি এখন কোথায়? তোমাকে না দেখে, আমার বুক যে ফেটে যায়! তৎপরে তিনি বালিশে মুখচন্দ্র লুকাইলেন, ঘণ্টাতীত হইল, তথাপি তাহা বাহির করিলেন না। গৃহে যে ফোঁ ফোঁ শব্দ হইতেছিল, তাহা লীন হইল। ঝম্ ঝম্ শব্দে গৃহ পরিপূর্ণ। ইহা শুনিয়া নীলিমা মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মণীদিদীর পায়ের মলের শব্দ। গা হেলাইয়া দোলাইয়া চুল হেলাইতে হেলাইতে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে মণী পর্য্যঙ্কের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনোজ্জ্বলশ্যামকায়া হাস্যমুখী বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী তরঙ্গিণীগামিনী মণী চঞ্চলদৃষ্টিকে অচলা করিয়া নীলিমার মুখের দিকে চাইয়া টীপি টীপি হাসি ছড়াইয়া মধুরতা বিস্তার করিয়া বলিলেন, নীলিমা! কাঁদিচ্ছিস্ কেন লো?

বালিকা বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, তাঁর মণীদিদী চোখের সামনে।

কাল বাদে পোরশু সোয়ামীর ঘরে যেতে হবে, তবু কান্না, এই বলিয়া রসিকা খল খল করিয়া হাঁসিয়া উঠিয়া আবার বলিলেন, নীলি! তোর শয্যা সতানাথের বুকের উপর পাতা রয়েছে। এ শয্যায় শুতে তোর কি লজ্জা হয় না? যদি চির কাল শুবি, আমার কাছে একটী মন্ত্র শিখে যা——

চোখের পরে চোখ দিয়ে,
হেসে ঘুরি ফিরিয়ে,
চট্ করে লো নীচের পানে মুখ্ রেখে দিবি,
তবে মনোহরা হবি।
চার গাছিতে লাগায়ে দম,
ঝম্ ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্,
চমকে দিয়া সোয়ামীর প্রাণ, চটক্ দেখাবি,
তবে আট্ কাতে পার্ বি।

ঘোমটা খুলে অন্তর থেকে,
হাঁসি মেখে চোখে মুখে,
সোয়ামী দেখ্‌বি, সোয়ামী দেখ্‌লে, চট্‌ করিয়া সট্‌ দিবি,
হেসে ভুলে ফেলাবি।
লাজে হাসি মিশি কথা,
আধ্‌ আধ্‌ করে ভাস্‌বি সেথা,
লাজকে যদি চোখে রাখিস্‌, ফাঁদ পেতে চাঁদ আট্‌কাবি,
আহ্লাদ থেকো মাগ হবি॥

রসিকার শ্লোকে নীলিমার বুকে শ্লোক-শেল বাজিল। রসিকা হাসিয়া বলিলেন, দাদা! তোকে কি ঠাকুরুণদিদী বানিয়েছেন?

নীলিমা। দাদা আমার নরেণ দাদার মোতন। দিদি! দাদা এখানে এলো না কেন?

মণী। তুই আর দাদা দাদা করিস্‌নে। দাদার সঙ্গে দেখা হওয়া দূরে থাকুক্‌, আমাদের সঙ্গে হবে না।

নীলিমা। কেন?

মণী। রাজার রাণী হোলে তোকে কি বাপের বাড়ী পাঠাবে?

নীলিমা। দিদি! তবে রাজার ঘরে মা আমার সম্বন্ধ কল্লেন কেন? আমি জানিতাম, দুঃখীর সঙ্গে বিয়ে হোলে শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়, রাজার সঙ্গে কল্লে হয় না। রাজাকে বিয়ে কল্লে, যদি তাঁদের ঘরে থাক্‌তে হয়, তবে রাজাকে বিয়ে করায় কি সুখ? আমি যদি চির কাল ঘরে থাক্‌তে না পাই, চির কাল দাদাকে দেখ্‌তে না পাই, তবে আমার কি সুখ দেখে, মা এত আহ্লাদ করে এত খরচ পত্র কোত্তেছেন?

মণী। পোড়ামুখি! এমন রাজাকে বিয়ে কত্তে কত কত লেখা পড়া যানে, এমন সুন্দরী সুন্দরী রাজা রাজড়ার মেয়ে শিব পূজা করে। তুই তাঁকে বিয়ে কোর্‌বি না? কি পোড়াকপাল!

এক বার সোয়ামীর বাড়ী গেলে সেখান হইতে তোর নিজে-রই আর আস্তে ইচ্ছা হবে না। স্বর্গের চেয়েও সেখানে তুই সুখে থাকবি। আর তোর যে সেই সত্যনাথ, আহা! তিনি নন্দন কাননের রতিপতি। তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখি-য়াছি। আমার ঘর যে দেশে, তাহা তাঁর রাজ্য। আমাদের তিনি বলেন, রাজকুমার এসে পাশ করিয়াছেন। আমাদের তিনি কে? বুঝ্‌তে পারিয়াছিস্ নীলি? যিনি আমার নাইট্‌স্কুলের মাষ্টার। তোর মাষ্টার তোকে কত পড়াবেন, কত শুনাবেন। আমার ইচ্ছা হয়, তোর হয়ে আমি তাঁকে বিয়ে করি, কোর্‌বো?

এই বলিয়া মণী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নীলিমা। দিদি! আমি তোমার পায়ে পোড়ি। আমার হোয়ে তুমি তাঁকে বিয়ে কর, আমার গহনা তুমি নেও। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলিতেছি, আমি এ জন্মে কাহাকেও বিয়ে করিব না, সলীল দাদাকেও না। আমি কেবল দাদার সঙ্গে এক জায়গায় থাকবো, আর কিছুই না।

মণী হাসিয়া বলিলেন, পুরুষরা বড় মিথ্যা বলে না—

সময়গুণে খুন করিবে, গুণ দিয়া দুচোখে।
(যেমন) ডুবায়ে গা, না দেয় রা, কুমীর প্রথম দেখে॥
যখন ধরে, হুঙ্কার ছাড়ে, জল করে তোলপাড়।
চাড় ছোড় থাক্ রক্তমাংস, শেষে গিলে হাড়॥

নীলিমা এ কথার কোন মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া অন্য কথা জিজ্ঞাসিলেন, দিদি! তোমার সোয়ামী তোমাকে কেমন ভাল বাসেন?

মণী। তিনি ভালবাসার গুরুমহাশয়, আমাকে ছেড়ে কত ছট্‌ফট্ কচ্চেন।

নীলিমা। তিনি তোমাকে কি বলে ডাকেন?

মণী। কি বলে আবার ডাক্‌বেন?

নীলিমা। তোমাকে কি মণীদিদি! মণীদিদি! বলে ডাকেন?

মণী হাসিয়া বলিলেন, না।

নীলিমা। তোমাকে কি তোমার সোয়ামী সঙ্গে কোরে বেড়ান? এক পাতে বসাইয়া ভাত খাওয়ান?

মণী হাসিয়া বলিলেন, হাবি! সোয়ামীর সঙ্গে কি বেড়াবার যো আছে? না ভাত খেতে আছে? বাপ্ রে! আমি এক দিন তাঁর সঙ্গে একটী কথা কহিয়াছিলাম বলিয়া ঠাকুরুণের কাছে কত বোকুনি খেয়েছি।

নীলিমা। তবে তোমার সোয়ামী তোমাকে ভাল বাসেন কেমন কোরে দিদি? দাদা আমাকে, নীলিমা দিদি! নীলিমা দিদি! বলে ডাকেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়ান, ভাত খান, আমাকে কত শ্লোক শিখান। হাঁ মণীদিদি! যদি তোমাকে তোমার সোয়ামী ভাল বাসেন না, তবে তুমি সেখানে যাও কেন? একশ বার তাঁর কথা বল কেন? তাঁর জন্য আকূপাকু কর কেন?

মণী নীলিমাকে কোলে তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পর ক্ষণে তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন।

নীলিমা চমকিয়া বলিলেন, তুমি বড় দিদী হোয়ে আমাকে নমস্কার কোল্লে কেন?

মণী মনে মনে বলিলেন, ভগিনি! তুমি মানুষী নও, ঈশ্বরী। আমি নারকী। তৎপরে তিনি ক্ষণ কাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীলি! তোর বয়স্ কত?

নীলিমা। এই পোনর বৎসরে পড়িয়াছি।

মণী ভাবিলেন, পোনর বৎসরে পড়িয়াছে, কিন্তু পাপের কিছুই জানে না। হায়! আমি বার বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে উন্মাদিনী হইয়াছিলাম। আমার ননদিনী, আমার-ভাসুরপত্নীগুলি কি দুষ্টা। আর ভাবিলে কি হইবে? নীলিমা যদি এই অবস্থায় থাকে, এবং ইহার যদি পুত্র না হয়, তাহা হইলে, মাসীর বিষয় গুলি পরের হস্তে যাইবে। আমি যদি, কুকার্য্য সুখের কার্য্য,

এই সংস্কার নীলিমার মনে জন্মাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, সকল দিক্ রক্ষা হয়। এইরূপ ভাবিয়া মণী চক্ষু, মুখ ঘুরাইয়া গাত্র দোলাইতে দোলাইতে বলিলেন—

কোলে চোড়ে, গলা ছেঁদে,
মুখের কাছে মুখ্ দিয়ে, স্বামীর চোখে চোখ্ দিয়ে।
কাল জলের পদ্মের মোতন,
স্বামীর কোলে ফুটিয়ে, রবি আলো করিয়ে॥
আদর-ভরে শ্লোক কেটে,
ভুলাবি তুই তাঁরে লো, চোখের পরে চোখ্ দিয়ে।
দেরি নাই আর দুদিন বাদে,
কোল-দোলাতে চোড়্বি লো, কেন মোবিস্ কাঁদিয়ে॥

নীলিমা মণীর পবিত্র স্নেহ ভাবিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। শ্লোক বলিতে বলিতে মণীর মুখ বিবর্ণ ও কথা অস্পষ্ট হইতেছিল। বলা শেষ হইলে, তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন, নীলি! এ উৎসাহ নয়,—কাল। আমার প্রথম বয়সে এ সব কথা শুনিলে গুপ্ত প্রেম উথলিয়া উঠিত। স্বামী প্রেমিক হইলে রক্ষা, নতুবা প্রেম করিতে যাইয়া স্বহস্তে বিষ গিলিতে হয়। তৎপরে তিনি ভাবনা ছাড়িয়া আপনার অভীষ্ট পূরিবার সোপান দেখিয়া, নীলিমাকে কোলে লইয়া বলিলেন, ওলো! তিনি তোকে এই রকম কোরে নাচাবেন——

কোল-দোলাতে চোড়েছো।
গলায় বাহু এঁটেছো॥
পলাও লাজ আয়ি লো।
কোলে কোকিল গাউক্ লো॥
পলাও লাজ আয়ি লো।
কোলে পদ্ম ফুটুক্ লো॥
পলাও লাজ আয়ি লো।
কোলে হরিণ চাউক্ লো॥

মণী উঠিয়া নীলিমাকে দোলাইতে লাগিলেন—

দুল্ দুল্ দুল্ প্রাণটী দুলে।
বিদ্যুৎ দুলে মেঘের কোলে॥
দুল্ দুল্ দুল্ প্রাণটী দুলে।
কল্‌সী দুলে কাল জলে॥
দুল্ দুল্ দুল্ প্রাণটী দুলে।
ফুলে মোড়াই লতা দুলে॥

(হাত ছাড়িয়া দিয়া)—

হাত ছেড়ে দিয়াছি এবা।
কর তুমি হিন্দল সেবা॥
চাঁদটী দিয়া চাঁদ নেহালে।
নীচে চুলের মেঘটী দুলে॥

নীলিমা আহ্লাদিতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, দিদি! দাদা কি আমাকে এইরূপ করে দোলাবেন? ইহা শুনিয়া মণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, না, সত্যনাথ।

এই সময়ে নিস্তব্ধ নিশাকে জাগরিত করিয়া এই গানটী তাঁহাদের কর্ণে বাজিল।

অতল সলিল তলে, ডুবিল মম সুখআশা।
আশা সহ জীব চড়ন্দায়, হাবু ডুবু হাঙর গ্রাসা॥
হাঙরে পা কামড়ে টানে, উপরে মরি নৈরাশ-বাণে,
আঁখি জগৎ নাহি জানে, ছি ছি ছি সুখ পিপাসা॥

ইহা শুনিয়া নীলিমা ভাবিলেন, ইহা সলীল দাদার গান, পশ্চিমস্থ অশ্বত্থতল হইতে আসিতেছে। তিনি দাদা গো! বলিয়া পশ্চিম দিকে দৌড়িলেন। ক্রমে গীত লীন হইল। নীলিমা দৌড়িয়া যাইয়া একটী অশ্বত্থের স্তম্ভকে ধরিলেন এবং ক্ষণ কাল মৌনভাবে থাকিয়া গদ গদ স্বরে বলিলেন, দাদা! তুমি এত দিন আমাকে ছেড়ে কেমন কোরে ছিলে? স্তম্ভের উত্তর নাই। তৎপরে নীলিমা বলিলেন, কথা কহিতেছো না

কেন দাদা? তুমি আমার উপরে কি রাগ করিয়াছ? তৎপরে তিনি জানিলেন, ইহা দাদা নহে, অশ্বত্থস্তম্ভ। নীলিমা অশ্বত্থতলে হাতড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথাও দাদাকে এবং কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না। দাদা বুঝি গাছের উপরে লুকাইয়া রহিয়াছেন এই ভাবিয়া তিনি গাছে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তৎপরে তিনি শোকাকুলচিত্তে বলিলেন, আমাকে দেখে লুকালে কেন দাদা? নাই আমাদের বাড়ী যাবে, এক বার আমাকে দেখা দেও। আমার মন কেমন কেমন করে যে। এই বলিয়া তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন এবং যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ হইতে দুই ফোটা জল বালিকার গাত্রে পতিত হওয়াতে, বোধ হইল, আকাশবালারা যেন বালিকার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাঁদিতেছেন। তৎপরে বালিকা বলিলেন, আমার বিয়ে হবে, এই কুকথা শুনে তুমি কি লুকালে? হায়! চুনী না মরে আমি মরিলে বেশ হইত। অন্ধকার অপনীত হইলে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকে ধীরে ধীরে উদিত হইতে দেখিয়া বালিকা বলিলেন, হে চাঁদমামা! তুমি মায়ের, আমার, দাদার, হারীর, ফুলীর মামা। মামা! দাদা কোথায় গেলেন, বল না? মা তোমাকে পূজা দিবেন, তুমি বল না মামা! আমার দাদা কোথায়? চন্দ্র কোন উত্তর দিল না। তৎপরে বালিকা কাতর দৃষ্টিতে বৃক্ষের উপর চাইয়া রহিলেন। এই সময়ে মণী আসিয়া নিলীমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেলেন। নীলিমা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—ooo—

ভালবাসার প্রভাব।

অদ্য নীলিমার বিবাহ। বিবাহের আয়োজনের একশেষ বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে যেরূপ গোল, সেইরূপ কোলাহল হইতেছে। সুন্দরীর দল কোন স্থানে বসিয়া আকাশ পাতালের গল্প আরম্ভ করিয়াছে এবং কতকগুলি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাটীর পশ্চিম প্রান্তরে বৃহৎ সভা। সভার চতুর্দ্দিকে রেইল, উপরি চন্দ্রতাপ। চন্দ্রাতপতলে শত শত ঝাড়। রেইলের ধারে শত শত চেয়ার। শত শত স্তম্ভে শত শত চিত্রপট। রেশমের চাদর বিছানা হইয়াছে; তদুপরি সহস্র সহস্র বৃহৎ উপাধান, হাজার হাজার রৌপ্যনির্ম্মিত গুড়গুড়ী এবং সহস্র সহস্র হুকা স্থাপিত। দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র শত্রু যেরূপ দুর্গের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ বাটীর চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক ঘুরিতেছে। শত্রুরা দুর্গ বেড়িলে যেরূপ দুর্গস্থ সৈন্যরা ভয়ে কোলাহল করিতে থাকে, সেইরূপ বাড়ীর লোকেরা কোলাহল করিতেছে। শত্রুদল ভেদ করিয়া দুর্গাধিকারীর সেনাপতি যেরূপ রসদ লইয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এক এক জন কর্ম্মচারী শত শত দ্রব্যবাহক লইয়া বটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বাটীর মধ্যে শত শত শিবিকা প্রবিষ্ট হইতেছে। এই সময়ে সান্ধ্যা আসিল। ভৃত্যেরা আলোক জ্বালিয়া দিলে শত শত শঙ্খ এবং নদীতীরস্থ শত শত নহবৎ এককালে গর্জ্জিয়া উঠিল। দুই একটা বোমের গাছে

আগুন ধরাইয়া দিলে তাহা ভীষণ শব্দে ফাটিতে লাগিল। এই রূপে এক ঘণ্টা দুই, ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কাল কন্যাকর্ত্তার বাটীতে যে শব্দ হইতেছিল, তাহা সহসা অন্য শব্দে ঢাকিয়া ফেলিল। বরকর্ত্তার বাটী হইতে কন্যাকর্ত্তার বাটী পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল বাজীর গাছ পোঁতা ছিল, তাঁহাতে আগুন দেওয়াতে শব্দ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ঢোলীর ঢোলের শব্দে, শিবিকা-বাহী বেহারাগণের হুঁ হুঁ শব্দে, পদাতিকের, সৈনিকের ও হস্তীর হুঙ্কারে, ঘোড়ার হ্রেষা শব্দে পূর্ব্ব শব্দ চতুর্গুণ হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। দুই তিন শত বালক, বর আসিতেছে, বলিয়া প্রান্তরস্থিত পশ্চিমের রাস্তায় দৌড়িল। বালকদের সহিত প্রথমে আগমনকারী সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈনিকদের সাক্ষাৎ হইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় মোমের গাছে মোমের বাতির আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বালকেরা আলোক-সাহায্যে সাহসী হইয়া অশ্বারোহী সৈনিকগণকে ভেদ করিয়া পদাতিকগণের নিকটে যাইল এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বাদ্যকারদিগের সম্মুখে আসিল। তাহারা বাদ্যকারগণকে অতিক্রম করিয়া শিবিকার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া সজ্জিত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাইল। তৎপরে তাহারা বরের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সুচারু চতুর্দ্দোলার নিকটে যাইয়া পহুছিল এবং বরকে উন্নতকায় কার্ত্তিকের মত অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিল। দুই জন কামিনীকে বরকে ব্যজন করিতে এবং আর দুই জনকে বরের সম্মুখে নাচিতে দেখিয়া বালকেরা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল——

ধর্ ধর্ ধর্ বরের লেজে ধর।
আচ্ছা করে, কানটী ধরে, গালে মার্‌না চড়॥

বালকদের মধ্যে এক জন বৈষ্ণবের ছেলে বলিল——

মুছলমেনে বর এটা জেঠার যোক্তন।

নাকের উপর তিলক নাই এর মাথাতে চৈতন ॥

তাহাদের মধ্যে এক কৃষকপুত্র বলিল——

বরের পা, গোদা পা, কাপড় জড়ান।
মেয়ের মত, সীতা কাটা, মাথা নাই কামান ॥

তাহাদের মধ্যে এক জন মুসলমানের ছেলে বলিল——

চাচা আজ, খাঁচায় পুরে, বরকে দিবে গোর।
দরিয়ার পাঁচ পীর, বদোর বদোর ॥

বালকদের সুমধুর গালি শুনিতে শুনিতে বর সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বরাসনে বসিলেন। সভার চতুঃপার্শ্বের শত শত চেয়ারে শত শত বরযাত্রী বসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শত শত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন। দার্শনিকেরা আত্মা, ঈশ্বর, সৃষ্টি, পরমাণু, মুক্তি, সুখ, দুঃখ ও ভূত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের তর্ক করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ন্যায় স্মার্ত্তবাগীশেরা মনু, মিতাক্ষরা, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতার বিচার করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে জ্যোতির্ব্বিদেরা ভাস্করাচার্য্য, বরাহ, মিহির প্রভৃতির শাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন।

এক জন স্মার্ত্তবাগীশ এক জন জ্যোতির্বিদ্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, ভো জ্যোতির্বিৎ! মস্তকে যষ্টি পতিত হইলে কি ফল হয়? জ্যোতির্বিৎ সাহঙ্কারে বলিয়া উঠিলেন, মস্তকে যষ্টি পড়িলে রাজা হয়। স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয় আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়! এ কথা সত্য কি?

জ্যোতির্বিৎ। স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়! আপনি যে খ্রীষ্টানের মত কথা বলিতেছেন। ওহে! শাস্ত্র কি কখন মিথ্যা হয়? ম্লেচ্ছভাষাবিদ্ ব্যক্তিগণের সঙ্গে থাকিয়া আপনার এইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছে।

ইহা শুনিয়া স্মার্ত্তবাগীশ আহ্লাদে বলিলেন, না, শাস্ত্র কখন মিথ্যা হয় না। এই দেখুন, বলিয়া, নগুকজাড়ত ভঙ্গরায়

খুলিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য-মণ্ডলী স্মার্ত্তবাগীশের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয় রাজা হইবেন। স্বজাতীয় ব্যক্তি রাজা হয়েন ইহা আহ্লাদের বিষয়। এই বলিয়া সকলে তাঁহার মস্তক দেখিতে লাগিলেন। উত্তরীয় বস্ত্র খোলা হইলে একটা বিছা তদীয় মস্তকের উপরিভাগ হইতে তেজে বাহির হইয়া কর্ণমূলে দংশন করিল। স্মার্ত্তবাগীশ বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। দংশনের ভয়ে অন্যান্য ব্যক্তিরা উঠিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। কতকগুলি লোক স্মার্ত্তবাগীশকে সভাস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

সভার এক দিকে বাই নাচ, খেম্‌টা নাচ, যাত্রা প্রভৃতি এবং অন্য দিকে নাটকাভিনয়, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি একে একে হইয়া গেল। তৎপরে বিবাহারম্ভ। বর ছান্নাতলায় যাইয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত একখানি পীঠে বসিলেন। উভয় পক্ষের পুরোহিত মহাশয়েরা বিবাহ দিবার জন্য স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রিগণের মধ্যে কতকগুলি বৃদ্ধ ব্যক্তি বিবাহের নিকটে একখানি গালিচায় বসিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কন্যাকর্ত্রী কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত বরের সম্মুখে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কন্যাকে আনিতে লোক পাঠান হইল। কন্যা কপাটে অর্গল বন্ধ করিয়া শয়ানা। দাসীরা তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। কন্যা ঘর হইতে উত্তর করিলেন, আমি বিবাহ করিব না, তোমরা আমাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বিরক্ত করিও না। কন্যার মাতা ইহা শুনিয়া সত্বর আসিয়া কন্যাকে দ্বার খুলিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। ইহা শুনিয়া কন্যা কাতর বাক্যে বলিলেন, মা! তুমি যদি আমাকে কাটিয়া ফেল, তথাপি আমি বিবাহ করিব না। বরযাত্রীদিগের কর্ণে এই সংবাদ পঁহুছিল। লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, আর বিলম্ব করা অনুচিত ভাবিয়া রাজকুমার অনুমতি দিলেন, কবাট ভাঙ্গিয়া পাত্রীকে

আন। ইহা শুনিয়া শত শত তেজস্বী দরওয়ান যাইয়া শত শত পদাঘাতে কবাট ছুটাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নীলিমাকে বিবাহস্থলে আনয়ন করিল। বালিকার অকম্পিত হস্তে কাঠারী। কেহ তাহা তদীয় হস্ত হইতে ছাড়াইতে পারিল না। কয়েক জন ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে পীঠে বসাইতে চেষ্টা করিলে, বালিকা আপনার স্কন্ধদেশে কাঠারীর আঘাত করিলেন। তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে কাঠারী পড়িয়া গেলে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তদীয় নয়ন দুইটী মুদিত হইল। আহত স্থান হইতে অনবরত রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। অত্রস্থ লোকেরা কোলাহল করিয়া উঠিল। কন্যার স্নেহময়ী জননী কাঁদিতে কাঁদিতে ভূশয্যায় শয়ানা মৃতকল্পা নীলিমাকে অঙ্কে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটী বালিকার নিকটে অসংখ্য বরযাত্রী পরাজিত হইল। বিবাহস্থল হইতে একটী যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে গাইয়া চলিয়া গেলেন——

প্রণয়ে জীবিত প্রাণ! প্রিয়তমা হীনে বাঁচ?
সঙ্গিনীর সঙ্গ ছেড়ে, কি করিয়া দেহে আছ?

যুবক প্রান্তরস্থিত এক অশ্বত্থতলে বসিয়া পড়িলেন। তিনি চক্ষু মুদিয়া অন্তরে দৃষ্টি প্রসরণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, হৃদয়কুটীর ভাঙ্গিয়া তাঁহার বহু দিনের সঞ্চিত ধন কে হরণ করিয়া পলাইয়াছে। তৎপরে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যুবক আবার দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় আগুন লাগিয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং প্রাণ-হরিণ জ্বলনে অস্থির হইয়া সবলে তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই যন্ত্রণার অবসানে তিনি চক্ষু খুলিয়া চন্দ্রশোভিত আকাশের দিকে চাইয়া দেখিলেন, আকাশে তারা নাই, চাঁদ নাই, কিছুই নাই, কেবল ঘোর অন্ধকারের রাশি চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। তিনি এত দিন আকাশের মধ্যস্থলে

যে দেবীকে কল্পনা চক্ষে বসিতে দেখিতেন, তাহা আজি দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে তদীয় চক্ষে আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া প্রখর অগ্নিশিখায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া শান্ত হইবার আশায় কৌমুদীময় জগতের দিকে চাইলেন, কিন্তু তদীয় চক্ষে জগৎ শ্মশানভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল, শবভূকেরা উন্মত্ত হইয়া দৌড়িতে লাগিল, কয়েকটা উন্মত্ত শৃগাল তাঁহাকে কামড়াইতে আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া যুবক গর্জ্জিয়া শৃগালদিগকে বলিলেন, আমার মরিবার ভয় নাই, তোরা আমাকে মারিয়া ফেল। তৎপরে ক্ষিপ্ত শৃগালেরা চক্ষু দিয়া তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে লাগিল। ইহাতে যুবক ভূমিতে পড়িয়া মৌনভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শৃগালেরা ক্ষণ কাল তাঁহাকে দংশন করিয়া চলিয়া গেলে যুবক ভূমি হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সংসারে আগুন লাগিয়াছে, উন্নতকায় ভীমমূর্ত্তি কয়েক জন লোক সেই অগ্নির মধ্য দিয়া মারিতে মারিতে তদীয় হৃদয়ের সামগ্রীটীকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে দৌড়িলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—000—

এক ভাব।

নিস্তব্ধ রজনীতে পূর্ব্ববাহিনী খালের উত্তর-দক্ষিণ-লগ্ন কাষ্ঠনির্ম্মিত সাঁকোর উপরি চারি জন যুবক মৌনভাবে বসিয়া আছে। তন্মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি সে বেটাকে শাস্তি না দিই, তাহা হইলে এই খালে

ডুবিয়া মরিব। এ বিষয়ে তোমাদের মত কি? অন্য তিন জন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, আমাদেরও এই মত। তৎপরে সকলের বাক্যরোধ হইল। ক্ষণ কাল পরে আবার এক জন গর্জ্জিয়া বলিল, ভোলানাথ! তাকে যখন বিনা দোষে দণ্ড দিয়াছে, তখন আমাদিগকে কি দেওয়া হয় নাই? ইহা শুনিয়া অপর তিন জন কাঁপিয়া উঠিল। এই সময়ে সলীল চীৎকার করিতে করিতে খালের অতল জলে লম্ফ দিয়া ডুবিলেন। তাঁহাকে তুলিবার জন্য চারি জনের মধ্যে দুই জন তাঁহার সঙ্গে লম্ফ দিয়া জলে পড়িল। তিন জন জলে ডুবিলে সাঁকোস্থিত অপর দুই জন দেখিল, দুই জনে জলমগ্ন যুবককে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিতেছে। তাহারা সকলে সলীলকে সাঁকোর উপরি ফেলাইয়া কৌশলে চেতন করাইল। তিনি বলিলেন, আপ-নারা আমাকে তুলিলেন কেন? আপনারা ভাবিতেছেন, এক জনকে বাঁচাইলাম, কিন্তু আপনারা তাহার শান্তিপথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জ্বলন্ত অনলে ফেলিয়া দিলেন। প্রাণ যায়, ছাড়িয়া দিউন, আমি নীলিমার সঙ্গে যাই। ঐ দেখুন, দূতেরা কুসুম-কায়া বালিকাকে অগ্নির মধ্য দিয়া মারিতে মারিতে লইয়া যাইতেছে। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিউন। নীলিমা! তুমি কাঁদিও না কাঁদিও না, আমি তোমার নিকটে যাইতেছি। রে সয়তানেরা! তোরা কি জন্য বালিকাকে মারিতেছিস্? বালিকার পাপ কি? প্রণয়ে কি পাপ? দাঁড়া, তোদের মাথায় পদাঘাত করিয়া ঐ জ্বালা নিবারণ করি। একজন যুবক ক্ষিপ্ত যুবকের কথার ভাব বুঝিয়া বলিল, ভাই! তুমি স্থির হও, আমি দেখিতেছি, তুমি একজন প্রেমিক, প্রণয় যে প্রাণের স্বার্থ, তাহা তুমি জানিয়াছ। যে ব্যক্তি আমা-দের প্রাণের স্বার্থ ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে তুমি শাস্তি দিবে কি না? যুবক উন্মত্ততা ত্যাগ করিয়া তাহাকে বলিলেন, আপনি বলেন কি, মানবমাত্রই একপ্রাণ, তবে শাস্তি দিব কাকে? ইহা

শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, মানবমাত্রই যে একপ্রাণ, তাহার প্রমাণ কি? সলীল উত্তর করিলেন, আমার যে জীবন শস্য, জল, দুগ্ধ, বায়ু, সূর্য্যালোক, চন্দ্রের কিরণ, ধূলি, তৃণ প্রভৃতি সংসারের সমস্ত পদার্থে রহিয়াছে, আপনারও সেই জীবন, সেই সকল পদার্থে রহিয়াছে। আমি মরিলে আমার তাপ, বায়ু, রস, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আমার শরীরে আছে, তাহা যেমন জগন্ময় হইবে, আপনারও সেই সকল পদার্থ তদ্রূপ হইবে। আপনার শরীরে বায়ু, তাপ, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ দিবা রাত্রি জগন্ময় হইতেছে, আমার শরীরেও সেই সকল পদার্থ সেইরূপ হইতেছে। সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অবিনশ্বর ও গমনশীল। আমার জীবন, আপনার জীবন, পশুর জীবন, উদ্ভিদের জীবন, এই সমস্ত জীবন জগৎ হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং এই সকল দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইতেছে। এই শুষ্ক তৃণে যে জীবন আছে, তাহাই গাভীর জীবন, গাভীর যে দুগ্ধ, তাহাই আপনকার জীবন এবং আপনার যে জীবন, তাহাই তৃণের জীবন হইতেছে। আপনার ন্যায় সমস্ত জীবেই এইরূপ ঘটিতেছে এবং আপনার সহিত সমস্ত পদার্থের সংযোগ আছে। যে সকল পদার্থে জীবন বৃদ্ধি হয় না, যাহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে এবং যাহাদের কষ্ট অনুভব করিবার শক্তি নাই, কেবল সেই সমস্ত পদার্থ লইয়াই আমরা আমাদের জীবন বৃদ্ধি করিতে পারি।

যুবক। ভাল, একথা মানিলাম, কিন্তু তুমি অজ্ঞানতা স্বীকার কর কি না?

সলীল। করি, কারণ ইহার সহস্র প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি।

যুবক। যদি অজ্ঞানতার দাস হইয়া কোন জীবনাংশ কষ্ট পায়, তাহা হইলে তাহার কষ্ট নিবারণের কোন উপায় আছে কি না?

সলীল। অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন জীবনাংশকে, অজ্ঞানতা তাহার শত্রু, ইহা বুঝাইয়া দিলে সে তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

যুবক। যদি সে না বুঝে?

সলীল। তাহার যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে, তখন সে বুঝিবে না কেন?

যুবক। অনেকে তাহাকে বুঝাইয়াছে, তবু সে বুঝে নাই কেন?

সলীল। তাহাদের অধ্যবসায় না থাকাতে এবং তাহারা প্রকৃত সুখ দুঃখ দেখাইতে না পারাতে তাহাকে বুঝাইতে পারে নাই।

ইহা শুনিয়া যুবক নিরুত্তর হইলেন। তৎপরে সলীলকে সমভিব্যাহারে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—oeo—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রাত্রি ঘণ্টা দুই তিন হইলে পল্লীর রাস্তা পার হইয়া, একখানি শিবিকা ময়দানে পড়িল। প্রান্তরস্থিত জীবগুলি শিবিকাগ্রগামী পশ্চিমদিকস্থ আলোকের মনোহর জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাইয়া রহিল। আলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গকুল ঝাঁকে ঝাঁকে তাহার দিকে দৌড়িল। শিবিকা যাইতে যাইতে একটা পুলের নিকটে হঠাৎ থামিয়া গেল। আরোহী বাহকদিগকে জিজ্ঞাসিল, পাল্কী থামালি কেন? বাহকেরা কোন উত্তর না দিয়া পাল্কী ফেলিয়া দৌড়িল, কিন্তু পলাইতে পারিল না। জনকতক লোক তাহাদিগকে ধরিয়া তাহাদের

হস্ত, পদ বাঁধিয়া উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিল। আরোহীও বাহকদের দশা প্রাপ্ত হইল। শিবিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া খালের গভীর জলে ভাসিয়া গেল। বাহক, আরোহী ও মশালজী যে স্থানে বন্ধনদশায় রহিল, সেখানে কয়েকজন লোক পাহারা দিতে লাগিল। অন্যান্য লোক দলবদ্ধ হইয়া পুলের নিকটে বসিয়া রহিল। যে বৃহৎ কাণ্ড সম্পাদিত হইল, তাহা অন্য ঘাটীর লোকে টের পাইল না। পুলের নিকটে হঠাৎ ছয়জন বরকন্দাজ সহ একজন অশ্বারোহী দারোগা পঁহুছিলেন। পঁচিশ জন খড়্গধারী সকলকে ঘেরিয়া আস্তে আস্তে গম্ভীর ভাবে বলিল, গোল করিলে তরওয়াল রক্তে রঞ্জিত হইবে। খড়্গধারীরা চর্ম্মরজ্জু দ্বারা তাহাদের হাত, পা বন্ধন করিল, কিন্তু তাহারা ভয়ে একটী বাক্যও কহিল না। বরকন্দাজদিগকে বাহকদিগের কাছে রাখা হইল। তেজস্বী প্রসূন অশ্বারোহীকে ঘোড়া হইতে বলপূর্ব্বক নামাইয়া তাঁহার হস্ত, পদ বাঁধিয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন, ইহাকে আমরা সকলে এক এক পদাঘাত করি। তাঁহারা সকলে দারোগাকে পদাঘাত করিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তাঁহাকে অপর সকলের নিকটে রাখা হইল। তৎপরে সকলে শিবিকারোহী আসমানের নিকটে যাইয়া তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বক্ষোদেশে শ্রেণীবদ্ধরূপে লিখিতে লাগিল, "তুমি যে কামের বশীভূত হইয়া নিরপরাধী অনীলকে চোর বানাইয়া কারাগারে রাখিয়া আসিলে, সে কাম তুমি নও, অজ্ঞ লোকদিগের কথা। পরের কথায় চলিও না, ইহাতে দুঃখ বই সুখ নাই।" আসমানের বক্ষঃ ভাসিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তৎপরে তাহারা দারোগাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়া তদীয় ললাটদেশে লিখিল, "ধনলোভে ভ্রাতাকে কষ্ট দিও না, জানিও, তুমি না প্রবঞ্চনার বশীভূত হইলে, পরকে বঞ্চনা করিতে পার না। আপনি দুঃখী

হইলে পরকে দুঃখী করিতে পার।" তৎপরে একজন যুবক দারোগার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল। দারোগার চীৎকার করিবার সামর্থ্য ছিল না। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন চারিজন সাক্ষীকে বাঁধিয়া আনিল। সর্দ্দার আসিবামাত্র চারি জনের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিল। এই ব্যাপার শেষ হইলে প্রসূন সাহায্যকারী লেঠেলদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দিয়া বলিলেন, আমি সংবাদ দিলে আসিতে বিলম্ব করিও না। তাহারা বিনয় সহকারে বলিল, প্রভোর আজ্ঞা হইলে, কবে না আসিয়াছি। প্রসূন বলিলেন, তোমরা আজ যেন রাতারাতি পৌঁছচ, দাড়ী, গোঁপ, যেন কামাইয়া ফেল। তাহারা অভিবাদন জানাইয়া, ঈশানকোণ পানে চলিল। প্রসূন ভোলানাথ ও অন্য সহচরদ্বয়ের সহিত পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন এবং প্রান্তর পার হইয়া বেলার প্রান্তভাগে নির্জ্জন স্থানের এক বাটীর দরজায় আঘাত করিলেন। আঘাত করিবা মাত্র ভৈরব দ্বার খুলিয়া দিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

———ooo———

বিশুষ্ক কোরক।

মৃতকল্পা নীলিমা উপরিতলস্থ সুরম্য কক্ষের দুগ্ধফেননিভ শয়নীয়ে শয়ানা। দুই খানি চেয়ারে দুইজন ইংরাজ ডাক্তার এবং মণী তদীয় মস্তকের নিকটে উপবিষ্ট। ডাক্তার দুইজন নীলিমার দিকে সকরুণ নয়নে চাইয়া আছেন। ডাক্তার ম্যাকল সফীল্ড চেয়ার হইতে উঠিয়া নীলিমার শয্যায় যাইয়া বসিলে, মৃণী ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিয়া সরিয়া বসিলেন।

ডাক্তার পীড়িতার দর্শন ও স্পর্শ করিয়া তদীয় রোগের প্রতীকার ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে নীলিমা অতিকষ্টে এক বার ডাক্তারের মুখের দিকে চাইয়া—দাদা! দাদা! বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ডাক্তারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। ডাক্তার অপূর্ব্ব বাঙ্গালাতে তাঁহাকে ডাকিলেন. এবং স্নেহার্দ্র চিত্ত হইয়া দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিলেন। নীলিমা ম্যাকেল সফীল্ডের কথার উত্তর না দিয়া তাঁহার জঙ্ঘাতে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞানাবস্থায় নানাপ্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। তিনি কাতর বাক্যে বলিলেন, দাদা! দাদা! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? আমি যে এত কাঁদিতাম, তাহাতে তোমার মনে কি দুঃখ হইত না? দাদা! দাদা! তুমি যাহা ভাবিতে, আমি যে তাহা জানিতে পারিতাম। দাদা! দাদা! ঐ আমাকে কে ধরিতে আসিতেছে। দাদা! আমাকে তুমি রক্ষা কর। তৎপরে তিনি নির্ব্বাক্ হই-লেন। মণী জিজ্ঞাসিলেন, নীলি! তুই কি বকিতেছিস? তিনি কোন উত্তর করিলেন না। মণীর মধুর কথা শুনিয়া ম্যাকেল সফীল্ড তাঁহার মুখের দিকে চাইলেন এবং মণীর চঞ্চল সুবঙ্কিম জ্যোতিঃপূর্ণ সলজ্জ চক্ষু দেখিয়া ভাবিলেন, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য এই চক্ষুতে বাস করিতেছে। মণী ডাক্তারের দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে গালাগালি দিতে এবং তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি বিবীর সঙ্গে আলাপ করেন কেমন করে? তৎপরে ডাক্তারদ্বয় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে অবগুণ্ঠন খুলিয়া মণী বলিলেন, নীলি! তুই কি কিছু খাবি? নীলিমা মণীর কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ বকিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি পর্ব্বতে উঠিতে পারিব না। আমাকে তুমি ছাড়িয়া দেও, আমি দাদার নিকটে যাই। আমি এত মিনতি করিতেছি, তথাচ আমাকে লইয়া যাইতেছ? দাদা গো! তুমি শীঘ্র আইস, আমি তোমার পায়ে পোড়ি। ও কি? পর্ব্বতের উপরি সোনার জলের সমুদ্র না কি? উহাতে আমাকে

ফেলিও না। হাঁ গা! ঐ সমুদ্রে এত লোক হাবু ডুবু খাইতেছে কেন? সাঁতার দিতে দিতে এত চীৎকার করিতেছে কেন? ওরে বাপ্ রে! মা গো! দাদা! আমাকে তোল গো? তৎপরে তিনি মণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তোমার পায়ে ধরি, আমাকে তোল দাদা! ঐ দেখ, একটা কুমীর হা করিয়া আমাকে গিলিতে আসিতেছে। দাদা! তুমি সত্বর আসিয়া আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। তৎপরে নীলিমা কাঁদিয়া উঠিলেন এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁর মণী দিদী তাঁর নিকটে বসিয়া আছেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত দিয়া মণীর গলা বেষ্টন করিয়া তদীয় মুখের দিকে চাইতে চাইতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, ঐ আমার দাদা তাঁদের ছাতের উপরি মস্তক নোয়াইয়া বেড়াইতেছেন এবং মাথা ঘুরাইতেছেন। দাদা! ফুস্ ফুস্ করিয়া তুমি আপনাপনি কি বকিতেছ? আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাইয়া কি ভাবিতেছ? দাদা! এখনও কি তোমার চিন্তা দূর হয় নাই? তুমি এত কি চিন্তা কর? আহা! আমার দাদাদের সুন্দর বাটীটী কেমন তিন ক্রোশী মাঠের ধারে! ঐ দাদা আকাশ হইতে চক্ষু লইয়া এখন কেমন ধান চারার দোলন দেখিতেছেন? আহা! সন্ধ্যার রৌদ্র নীল মাঠের উপরি পড়িয়া কেমন ঝক্ ঝক্ করিতেছে! দাদা! তুমি ইহা একলা দেখিতেছো? আমাকে কি দেখাবে না? চিন্তায় নিতান্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছ, তবু কি তুমি চিন্তা করিতে ছাড়িবে না? তোমার পায়ে ধরি দাদা! আর চিন্তা করিও না, যদি করিবে, তবে আমাকে তোমার চিন্তার বিষয় বলিয়া দেও। আমিও তোমার সহিত চিন্তা করিব। মণী দিদি! ঐ দেখ, দাদা কি চিন্তা করিতে করিতে ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। তুমি দাদাকে উঠাইয়া বসাও দিদি! তৎপরে নীলিমা কাঁদিয়া উঠিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

প্রায়শ্চিত্তারম্ভ।

আসমান প্রসূন ও তৎসহযোগী কর্তৃক অপমানিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নীহারকে দারুণ অপমানের প্রধান কারণ জানিয়া তিনি এক দিন ক্রোধে অধির হইয়া দাসদিগকে হুকুম দিলেন, তোমরা নীহারের হাত পা বাঁধিয়া মহাবনে ফেলিয়া আইস। আসমানের ক্রোধের দ্বিতীয় কারণ, এই সময়ে তাঁহার উপদংশ রোগ হইয়াছিল। তদীয় ক্রোধের তৃতীয় কারণ এই, এক্ষণে নীহারের যৌবন অতিক্রান্ত এবং উপদংশ রোগ হইয়াছিল। আসমানের আজ্ঞায় দুই জন দাস মহানন্দে নীহারের কক্ষে পঁহুছিল। তথায় আলোক জ্বলিতেছিল। নীহারের সর্ব্বাঙ্গে পারার ঘা ফুটিয়াছিল। তিনি শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। একে তাপকালের রাত্রি, তাহাতে বায়ু নাই, এজন্য তাঁহার কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা লাগিয়াছে। বকা উল্লা নীহারকে শয্যা হইতে সবলে টানিয়া, ভূতলে ফেলিয়া দিল। নীহার তাহাকে গালি দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বকা উল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিল, ঘু ঘু! সুখের বাসা পুড়ে গেছে। তুই তোর যে বাবার জোরে জোর কচ্ছিস্, সেই বাবার হুকুম কতদূর তুই তাহা কার্য্যে টের পাবি। তৎপরে সে সঙ্গীকে বলিল, ওরে আব্দুল্! আর দেরি করিস্ কেন? তোর কি মনে নাই, সেই এক দিন একটা কথা বলেছিলি বলে বেটী তোকে সাহেবের কাছে মার খাওয়াইয়াছিল।

আবদুল পূর্ব্ব কথা স্মরণে ক্রুদ্ধ হইয়া চর্ম্মরজ্জু দ্বারা নীহারের হস্ত পদ বাঁধিল এবং বস্ত্র দিয়া বাক্য রুদ্ধ করিল। বদ্ধ হস্তে অন্য রজ্জু বাঁধিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে পশ্চিম দিকে লইয়া চলিল। এই সময়ে নীহারের যন্ত্রণার একশেষ হইতেছিল, ঘর্ষণে তদীয় ক্ষত হইতে নিরন্তর রক্তস্রোতঃ বহিতেছিল। মুখ বদ্ধ থাকাতে তাঁহার যন্ত্রণা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না, কেবল তিনি আক্ পাক্ করিতেছিলেন। এই রূপে তাঁহাকে সারা রাত্রি টানিয়া লইয়া গিয়া দাসেরা প্রাতঃকালে তদীয় মুখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিষ্কৃত সালের এক মহাবনে ফেলিয়া আসিল। তথায় হিংস্রক পশু ছিল না, কেবল রাত্রিতে কাক শকুনিরা অবস্থিতি করিত। নিশান্তে সেই স্থলে কাক শকুনিদের হাট বসিয়া গেল। আজি তাহারা অন্যত্র আহারান্বেষণে যাইল না এবং সম্মুখে আহার দেখিতে পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে আহ্লাদে মৃতকল্প নীহারকে ঘেরিয়া ফেলিল। নীহারের হাত পা বাঁধা থাকাতে তাঁহার নড়িবার যো ছিল না। শবভুকেরা বড়শী সদৃশ ঠোঁট দিয়া তদীয় গাত্রের গলিত মাংস অনায়াসে ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। নীহারের কঠিন প্রাণ এত যন্ত্রণাতেও বহির্গত হইল না। তিনি যন্ত্রণায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে উপুড় হইয়া শুইলেন। তৎপরে চিত হইয়া শয়ন করিলে শবভুকেরা তাঁহাকে জীবিতা দেখিয়া সাহস করিয়া তদীয় মুখের মাংস খাইতে পারিল না। একটা কাক সাহসে ভর করিয়া তদীয় অধরের উপরি বসিয়া মাংস ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে তিনি দন্ত দিয়া তাহার পা কামড়াইয়া ধরিলেন। কাক যন্ত্রণায় কা কা করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বন্ধুর এই বিপদ দেখিয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কাক তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নীহারকে ঠোক্রাইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী কাকেরা কোলাহল করিতে করিতে গগন আচ্ছাদিত করিয়া নীহারের কাছে পঁহুছিয়া

তাঁহার উপরি চড়িয়া তদীয় মাংস ছিঁড়িতে লাগিল। অসংখ্য কাকে আচ্ছাদিত হওয়াতে নীহারকে আর দেখা গেল না। যেন একটা কাকের পাহাড় তাঁহার উপরি রহিয়াছে। বন অসংখ্য কাকের কা কা শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ কাক যেন মহাসমরে প্রবৃত্ত। এই সময়ে দুইটা শৃগাল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সেই স্থানে পঁহুছিলে কাকের পাহাড় অন্তর্হিত হইল। শৃগালেরা নীহারের পায়ে কামড়াইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং একটা গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া গহ্বর হইতে দৌড়িয়া বাহিরে পলাইয়া আসিল। গহ্বরে এক যোগ-সাধক ছিলেন। তিনি নীহারকে জীবিত দেখিয়া গহ্বরের এক সমতল স্থানে রাখিয়া গহ্বর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং উপলখণ্ডের আঘাতে এক বৃক্ষ হইতে অলক্ত সদৃশ কিঞ্চিৎ রস লইয়া যাইয়া নীহারকে খাওয়াইলেন। রসের প্রভাবে নীহার সহসা সরসা হইলেন। যোগসাধক কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া দিলেন, কেবল চক্ষু দুইটী দিতে পারিলেন না। কারণ কাকেরা চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়াছিল। তৎপরে যোগসাধক এক দিন নীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

নীহার। অমরগড়। আমি অন্ধ হইয়াছি, তথায় যাইতে পারিব না। আপনি যদি আমাকে বাঁচাইলেন, তবে আমাকে বাড়ী পঁহুছিয়া দিউন। তথায় আমার পিতা, মাতা, আর ভাই দুইটী আছেন।

যোগসাধক। আমি তোমাকে অদ্য রাত্রিতে যত দূর পারিব লইয়া যাইব, কিন্তু দিবাভাগে পারিব না।

ইহা বলিয়া যোগসাধক সেই রাত্রির মধ্যে নীহারকে বিরাজ-পুরে রাখিয়া আসিলেন। নীহার ক্ষুধায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিরাজপুরের চটীর দিকে চলিলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তথাপি তিনি চটীতে পঁহুছিতে

পারিলেন না। এই সময়ে এক বালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, কাপি! তুই কোথায় যাবি?

নীহার। বাবা! আমি বিরাজপুরের চটীতে যাব। আমার সঙ্গে আয় বলিয়া বালক আস্তে আস্তে নীহারকে লইয়া চলিল। তথায় যাইয়া বল্কলবসনা নীহার দোকানীদিগকে আহারের জন্য কাতর বাক্যে বারংবার জানাইতে লাগিলেন। তদীয় শরীরে পাপের চিহ্ন দেখিয়া কেহ তাঁহাকে দয়া করিল না, কেবল ভর্ৎসনা ও প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দিল। বেলা আড়াই প্রহর গত হইয়া গেল, তথাপি নীহারের আহার জুটিল না। চটীর নিম্ন-ভাগে অশ্বত্থতলে বসিয়া তিনি এত দিনের পর শোকপূর্ণ কণ্ঠে, অনীল! অনীল! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত অধীরা হইলেন। এই সময়ে পাপগুলি এক একটী করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার বুকে আপনি চপেটাঘাত করিতে এবং মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। চটীর লোকেরা নীহারের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে জুটিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে পাগলী ভাবিয়া একটী বালক তাঁহার লাটী কাড়িয়া লইয়া দৌড়িয়া অন্তরে দাঁড়াইল। নীহার লাটী চাহিলে সে বলিল, তুই সেই রকম কোরে মাথা খোঁড়, তবে আমি তোকে তোর লাটী দিব। নীহার হাসিয়া অনীল! অনীল! বলিয়া পুনরায় মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বালকেরা আহ্লাদে সঙ্কীর্ত্তনের ধরণে হাততালি দিতে দিতে এবং হো হো শব্দ করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। এই সময়ে কতকগুলি যাত্রী আহারান্তে উচ্ছিষ্ট ভাত ফেলিতে যাইতেছে দেখিয়া বালকেরা নীহারকে বলিল, ও পাগলি! তুই ভাত খাবি? নীহার আহ্লাদে বলি-লেন, খাব।

যাত্রীরা ভাত রাখিয়া দিল। নীহার আনন্দে খাইতে লাগিলেন। তিনি এক মুটা খাইতে না খাইতে দুইটা

বলবান্ কুকুর আসিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সেই ভাত খাইতে লাগিল। ক্ষুধাতুরা ক্রোধে দুইটা কুকুরকে চপেটাঘাত করিলে ক্ষুধাতুর কুকুর দুইটা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে কামড়াইতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গিয়া অশ্বত্থতলে বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, কে বলে পাপ কাল্পনিক? এখন বিলক্ষণ জানিলাম, মহাত্মা অনীল আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু এবং ভগিনী লজ্জাবতী জীবনের একমাত্র হিতৈষিণী। স্বামিন্! আমি কামান্ধ হইয়া তোমাকে অকারণ যে সকল কষ্ট দিয়াছি, ইহা কি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত? না, তত গুরুতর পাপের এরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? দেবকে নারকী করিবার এত তুচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? প্রেম, দয়া, স্নেহকে বিনাশ করিবার এত অল্প প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? সকলে বলে, নরহত্যা মহাপাপ। সে কোন্ নরহত্যা? যে নরহত্যা নিমিষের মধ্যে হয়। দুই বৎসর ধরিয়া তুষের আগুনে পোড়াইয়া আমি যে নরহত্যা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। অন্যকে এক গুণ কষ্ট দিলে তাহার শত গুণ কষ্ট পাইতে হয়। তৎপরে নীহার শোকে স্ফীত হইয়া বলিলেন, স্বামিন্! আমি কি সুখের জন্য তোমাকে কষ্ট দিয়াছি এবং তাহাতে কি সুখ পাইয়াছি? কিছুই নহে। তোমার সহিত যে সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা অকৃত্রিম এবং সর্ব্বদা আমার মনে উদিত হইয়া আমাকে সুখিনী করিতেছে। সেই সম্ভোগের সুখ মনে হইলে আমার হৃদয় অগ্নির খনি হয় কেন? এবং ছেলাবেলার খেলিবার সুখ মনে হইলে হৃদয় নন্দনবন হয় কেন? জানিলাম, সম্ভোগ অগ্নির খেলা এবং পবিত্র স্নেহ শান্তির খেলা। এখন মনে হইতেছে, আমি এত দিন যেন কোন অন্ধকূপে পড়িয়াছিলাম। অন্ধকার মাঠে পড়িলে যেমন কেবল দূরস্থিত আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, কেবল তাহার সেই ভালবাসা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু সম্ভোগ দেখিতে পাই

নাই। এক্ষণে জানিলাম, দুঃখ অন্ধকারময় এবং অকৃত্রিম সুখ আলোকময়। যে সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিতে দেখিতে আমি কাঁপিয়া উঠি কেন? তাহাতে প্রাণে কষ্ট পাইয়াছি, তাই কাঁপি, এবং তাহার চৈতন্য অন্ধকূপ তাই অন্ধকার দেখি। কুকার্য্য শেষ হইলে এক এক বার চৈতন্য হইত, মরিতে ইচ্ছা হইত, এবং কথন কথন বাল্য স্মৃতি আসিলে চৈতন্য হইত, প্রণয়কে ঈশ্বর ভাবিয়া ভজিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, কিন্তু তাহা জলবিম্বের মত স্মৃতিতে আসিয়াই মিলাইত। ঈশ্বরকে কোটী কোটী নমস্কার করি। তিনি আমাকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছেন যে আমি আর চৈতন্য-শূন্যা হইব না। আমি আর অধিক দিন সংসারে থাকিব না, দুই চারি দিন মধ্যে নিশ্চয় মরিব। এক্ষণে আমি অন্ধ এবং ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি। বন্যার জলের ন্যায় আমার শরীর হইতে নিরন্তর রক্ত ছুটিতেছে এবং পরিবার কাপড় টুকু নাই। স্বামিন্! এ দুরবস্থায়ও এক্ষণে আমি তোমার নাম স্মরণ করিয়া সুখিনী। হে প্রভো! তুমি কি আমাকে বিধবা ও ভ্রষ্টা ভাবিয়া আমার স্বামী হইবে না? আমি বিধবা, কি সধবা, ভ্রষ্টা, কি সতী, তাহা তুমি আমার বাল্যের বিবরণে বুঝিতে পারিবে। আমার যখন সাত বৎসর বয়ঃক্রম (জন্ম হওয়াবধি পাঁচ বৎসরের কথা স্মরণ হয় না) তখন আমি বাল্য সঙ্গি-নীদের ও তোমার সহিত নিরন্তর পবিত্র মনে খেলিতাম। তৎকালে আমার হৃদয়ে ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিসে সঙ্গিনীরা মনে কষ্ট না পায়, আমাকে লইয়া খেলে এবং তাহাদের সঙ্গে আমার কোন ক্রমে বিচ্ছেদ না হয়, আমি সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিতাম এবং প্রণয় স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই চিনিতাম না। নয় বৎসরের সময় আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে পুঁটীর বিবাহ দেখিয়া এক দিন আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল। তৎপরে আমি তোমাকে পবিত্র মনে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া

বিবাহ করিয়াছি, তাই তুমি আমার স্বামী। এই ভাবে এগার বৎসর গেল। পিতা আমার বিবাহ দিলেন। সেই অবধি পিতা মাতা আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিতেন না। আমি সর্ব্বদা গৃহের ভিতরে বদ্ধ থাকিতাম। মন যখন পবিত্র থাকে, তখন প্রণয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। বাল্যসঙ্গিনীদিগকে ছাড়িয়া আমি আমার দুইটী ভাযের সঙ্গে আর একটী ভগ্নীর সঙ্গে প্রণয় করিলাম। তুমি জান, আমার পিতা বড় মানুষ। বাঙ্গালীরা বড় মানুষ হইলে মেয়েদিগকে কায করিতে দেয় না, সুতরাং ভায দুইটীর আর ভগ্নীটীর কায করিতে হইত না। আমরা চারি জনে তাশ খেলিতাম। খেলা হইলে ভায দুইটী আপন আপন স্বামীর সঙ্গে রাত্রিতে যে সব ঘটনা হইত, নির্লজ্জা হইয়া তাহা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিত। যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন লুকাইবার দরকার কি? আমার ভগ্নীটীর একটী উপপতি ছিল। ভগ্নী তাহার সহিত যাহা করিত, তাহা আমাকে অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিত। তাহাদের কুকার্য্য ও কুপরামর্শ শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে আমার মনেও কাম অর্থাৎ সম্ভোগের ইচ্ছা জন্মিল এবং ক্রমে তাহা আয়তন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আয়তন বৃদ্ধি কি? অর্থাৎ যে সকল কুকথা ও কুকার্য্য নিত্য শুনা ও দেখা যায়, তাহারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। যেমন কশাইসন্তানেরা নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় হইয়া মনে করে, তারা যেন পৃথিবীতে কেবল জীবহত্যা করিতে আসিয়াছে। যে সময়ে আমার আশা বলবতী, তখন আমার পিতা মাতা আমার মত না লইয়া যাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, সে মরিল। আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিলাম। তাহার পরে যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহা তুমি সকলই জান, সুতরাং তাহা আমাকে বলিতে হইবে না। তাই বলি, তুমি যখন জীবিত আছ, তখন আমি বিধবা হইব কেন?

আমি তোমাকে পবিত্র মনে বিবাহ করিয়াছি। তাই তুমি আমার স্বামী। আমার মন পিতার নয়, আমার। লোকের মনই বিবাহ করে। পিতা যাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন, মন যদি তাহাকে বিবাহ না করিল, তবে পিতার বিবাহ দেওয়া মিথ্যা। মন বিবাহ না করিলে পিতা মাতা ও পুরহিত বিবাহ দিতে পারেন না। মনের অমতে কে কবে বিবাহ দিতে পারিয়াছে? পবিত্র মনে অর্থাৎ প্রকৃত মনে যে কার্য্য করা হয়, সেটা আপনার কার্য্য। পরের অপবিত্র কথাতে যে কার্য্য করা হয়, সেটা পরের কার্য্য। আমি পবিত্র মনে তোমাকে যে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আপনার কার্য্য। তুমি আমার স্বামী, জীবিত আছ, সুতরাং ভায দুহিটার ও ভগ্নীটার অপবিত্র কথাগুলি মনের উপরি থাকিয়া আমাকে যে কার্য্য করাইয়াছে, তাহা আমি করি নাই। সুতরাং আমি ভ্রষ্টা নই। ফলতঃ এ দোষে কেবল তাহারা দোষী, আমি নই। নিরীহা বালিকাকে তুষানলে পোড়াইয়া তাহারা কি তোমার দণ্ডনীয় নহে? যে পাপ আমাকে দণ্ড দিয়াছে, সে পাপের দণ্ড না হইয়া, আমার দণ্ড হইবে কেন? স্বামিন্! তুমি নিরপরাধিনীকে ক্ষমা কর। আমি কল্পনাচক্ষে দেখিতেছি, আমার এই কথা শুনিয়া তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয় যেন প্রেমে পূর্ণ হইয়া আসিল। তুমি অভাগিনীর জন্য অশ্রু ফেলাইতেছ। ফেলাইবে বৈ কি? তুমি আমার দুঃখে না কাঁদিলে কাঁদিবে কে? প্রভো! আমি মরিব। আমার জন্য তোমার কাঁদিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা সংসারে থাকিবে, তুমি তাহাদিগের জন্য ক্রন্দন কর।

নীহার চক্ষু মুদিত করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবনত মুখে ভাবিতেছিলেন। এত ক্ষণ বালকেরা তথায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তৎপরে তাহারা আমোদ করিয়া, মুটা মুটা ধূলি লইয়া নীহারের গাত্রে দিতে লাগিল। নীহার এই সুখচিন্তার ব্যাঘাত দেখিয়া বালকগণকে বিনয় সহকারে বলিলেন, বাবা!

তোরা কেন আমার গায়ে ধূলা দিস্? নীহারের 'তোরা' এই অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া একটী অভিমানী ধনিবালক বিমর্ষ হইল এবং দোকান হইতে অধিক পরিমাণ লবণ কিনিয়া সঙ্গিগণকে বলিল, তোরা এই লুণ লইয়া, মাগীর যেখানে কুকুরে কামড়াইয়াছে, সেই স্থানে মুটা মুটা ছুড়িয়া মার। ইহা শুনিয়া সকলে মুটা মুটা লুণ লইয়া নীহারের ক্ষত স্থানে ফিঁকিয়া ফিঁকিয়া মারিতে লাগিল। নীহার ইহার গরীয়সী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে এবং উঠিয়া পলাইতে লাগিলেন। অভিমানী বালক পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। নীহার পদাঘাতের যন্ত্রণায় অধিকতর কাতরা হইয়া চীৎকার করিতে করিতে গড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন দয়ালু ব্যক্তি আসিয়া বালকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নীহারকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—ooo—

দুঃখের অবসান।

কারাগারে অত্যন্ত মড়ক হওয়াতে তাহার পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে এক প্রকাণ্ড শ্মশানক্ষেত্রে গঙ্গাপুত্রেরা কারাগার হইতে দুই গাড়ী শব লইয়া ফেলিয়া আসিল। শবভুকেরা শ্মশানক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকস্থ ঝাঁটী বন হইতে বহির্গত হইয়া মহানন্দে শব খাইতে এবং পরস্পর মল্ল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শবরাশির মধ্যে যে এক জন জীবিত ছিলেন, তিনি অনীল। দুষ্ট জেলদারোগা অনীলকে জীবিতাবস্থায় ফেলিতে হুকুম দিয়াছিল। অনীল অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার উপরি দুইটা এবং

সম্মুখে বহুসংখ্যক শব পতিত রহিয়াছে, এবং অসংখ্য শবভুক্ তাহাদিগকে খাইতে খাইতে কোলাহল করিতেছে। কয়েকটা শৃগাল সহসা আসিয়া তাঁহার উপরিস্থ দুইটা শব খাইতে আরম্ভ করিল। অনীল দুঃখিতচিত্তে ভাবিলেন, এত দিনের পর বুঝি আমার ভবের নরকভোগ ফুরাইল। হে দীননাথ! আমাকে যদি আরও নরক ভোগ করাইয়া অকৃত্রিম বন্ধু প্রসূনকে দেখাইতে, তাহা হইলে তদীয় দীনবন্ধু-নাম সার্থক হইত। অথবা তুমি মাদৃশ মহাপাপীকে অন্তিম কালে সে সুখ দিবে কেন? প্রভো! আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে সেই অকৃত্রিম বন্ধুর স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব। হায়! মরিবার সময়ে পিতা মাতার শ্রীচরণ এক বার দেখিতে পাইলাম না। যিনি ভবের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী, আমার সেই জননী এখন কোথায় রহিয়াছেন? মা! এক বার আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও এবং তদীয় শ্রীচরণ দুইখানি পতিত পুত্রের মাথায় দেও। আমি যে দিন স্বেচ্ছায় তোমার শ্রীচরণ দুই খানি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই দিনই মরিয়াছি। আমি আপনার জন্য ভাবি না বটে, কিন্তু আপনি আমার জন্য দিবা রাত্রি ভাবিতেছেন। আপনি ঈশ্বরের মত কার্য্য করেন বলিয়া ঈশ্বরী হইয়াছেন।

ভাই প্রসূন! আমার সময় ফুরাইয়াছে। আইস, তোমার হাতে মাকে তুলিয়া দিয়া যাই। পাছে নরকে পড়িতে না দেও, এই ভয়ে তখন আমি তোমাকে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। সেই পাপে কি তুমি আমাকে দেখা দিবে না? ভাই! আমাকে এক বার দেখা দেও, এক বার জন্মের মত বিদায় দেও। হায়! আমি জগতে কেন আসিলাম, তাহার কি উন্নতি করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি মরিলে জগতে আমার রহিবে কি? ইহা বলিয়া তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন লোকের রব শুনিয়া

শবভুকেরা ভয়ে পলাইল। এক ব্যক্তি এক জন আলোক-ধারীর সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনী-লের শরীরের উপরিস্থ দুইটা শব টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি অনীলকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গেলেন এবং জেলার প্রান্তভাগস্থ প্রাচীরবেষ্টিত এক ইষ্টকালয়ের নিকটে যাইয়া দরজায় আঘাত করিলেন। বাটীর মধ্য হইতে এক জন দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা তিন জনে ঘরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে প্রসূন অনীলকে একটী শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সককে আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। তিনি এক জন প্রহরীর নিকট হইতে অনীলের এই বিপদের কথা শুনিয়াছিলেন। প্রসূন সঙ্গিগণের সহিত অনীলের কারাবাসের পর অলক্ষিতভাবে এই স্থানেই ছিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

——000——

প্রায়শ্চিত্তসমাপ্তি।

কালক্রমে অন্ধ নীহারের পিতা মাতা দরিদ্র হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সমাজের তাড়নায় ব্রাহ্ম এবং কনিষ্ঠ নরেন্দ্র ক্রিশ্চান হইয়াছেন। নরেন্দ্র একজন পাদরীর কাছে যাইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমাদের গ্রামের সমস্ত লোককে আমি এক নূতন উপায়ে ক্রিশ্চান করিব। ইহা শুনিয়া পাদরী মহাশয় আনন্দিত হইয়া খরচের নিমিত্ত তাঁহাকে কিছু টাকা দিলেন। নরেন্দ্র পল্লীগ্রামের লোকের রীতি নীতি বিলক্ষণ জানিতেন এবং টাকা পাইয়া প্রথমে এক চর্ম্মকারের বাটীতে

যাইয়া তাহাকে বলিলেন, হরে! তুই আমাকে একখানা খোল দে। ইহা শুনিয়া হরি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আমরা চির কাল আপনাদিগকে বাঁয়া তবলা দিয়া থাকি। আপনি আজি খোল চাহিতেছেন কেন? আপনার প্রতি কি চৈতন্য-দেবের কৃপা হয়েছে? এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া চৈতন্য-দেবের প্রতি অনর্গল গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃ-স্বরে হরিকে বলিলেন, হরে! এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় মানবগণ সত্যধর্ম্ম প্রভু যীশু খৃষ্টের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভয়ঙ্করী দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে। যে দয়াল প্রভু আমাদের উদ্ধারের জন্য নিজের রক্ত দিলেন, সেই দয়াময়কে বিস্মৃত হইয়া থাকা কি তাহাদের উচিত? তাহারা অজ্ঞানান্ধ হইয়া তৃণ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা ও প্রণাম করে এবং তাহার কাছে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। কি অজ্ঞানতা! কি অজ্ঞানতা! ইহা শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চর্ম্মকারের কর্ণে শেলবিদ্ধ হইল। তৎপরে সে অর্থ লইয়া বিরক্ত ভাবে নরেন্দ্রকে খোল দিল। নরেন্দ্র খোল স্কন্ধে করিয়া কতকগুলি ক্রিশ্চানের সহিত অমরগড়ের বড় রাস্তার ধারে যাইয়া অদ্য বেলা আড়াই প্রহরের সময় পঁহু-ছিলেন এবং সঙ্গিগণকে খোল ও করতাল প্রভৃতি বাজাইতে হুকুম করিলেন। এই অসম্ভব ভাব দেখিয়া তত্রত্য লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কীর্ত্তনকারীরা কিছু কাল খৃষ্টনাম করিয়া নিরস্ত হইলে নরেন্দ্র তাঁহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা আর কত কাল প্রভু যীশু খৃষ্টকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে? সয়তানের দাস হইয়া থাকিতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না? তোমরা দয়াল প্রভুর নাম লইলে স্বর্গীয় পিতার দক্ষিণে স্থান পাইবে। এই সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের দল গান ধরিল—

সবে ভাই খেলা ফেল, বেলা গেল, চৌপলাতে
প্রেম-বর আসে।
বরের যাত্রী, অনুযাত্রী শান্তিরসে ভাসে এ এ এ এ,
চল সব সুখের আশায়, দৌড় মেরে, ঐ দলেতে
যাইগে মিশে॥
বর দেখ্‌তে ভাল, নয় ত কাল, তাতে উজ্জ্বল বিকাশেএএএএ,
দেখ্‌লে চক্ষে, অন্তরীক্ষে অন্তরাত্মা আলোয় ভাসে॥

তৎপরে নরেন্দ্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এই যে গীত—নরেন্দ্র ইহা বলিলে একটী বালক তাঁহার লম্বিত কোঁচা একটী মেয়েকে ধরাইয়া দিয়া বলিল, নীহার! এই তোর নরেন দাদা। তুই ইঁহাকে আর ছাড়িস্ না। নীহার নরেন্দ্রের কোঁচা দৃঢ়রূপে ধরিয়া, দাদা! দাদা! বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কে? একজন যুবক বলিল, যিনি ভ্রষ্টা হইয়া অনীলের সহিত বহির্গত হইয়াছিলেন, ইনি আপনার সেই নীহার দিদী। ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রের বাক্য রুদ্ধ হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তৎপরে তিনি বক্তৃতাচ্ছলে বলিলেন, হায়! হিন্দুদের মধ্যে বিধবাদের বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকাতে তাহারা কি ভয়ানক ক্লেশ অনুভব করে? একটী যুবক নরেন্দ্রকে বন্ধুত্বভাবে বলিল, নরেন্দ্র বাবু! আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া বিধবাবিবাহটা চলন করুন না কেন? স্বয়ং না করিলে অন্যকে লওয়াতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া অনেকেই আহ্লাদে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সুযোগে বালকেরা নরেন্দ্রকে উপহাস করিয়া তদীয় গাত্রে ধূলি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন তাঁহার মুখে থুথু দিয়া পলাইল এবং দ্রুতবেগে পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তৎপরে নরেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ নীহারের বুকে এক লাথি মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। বালকেরা ধর ধর বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সঙ্গিগণের সহিত নরেন্দ্র দৌড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে শত শত বালক কোলাহল করিতে করিতে ধাবিত হইল। এই সময়ে নরেন্দ্রের একজন সঙ্গী তাহাকে বলিল, নরেন বাবু! খোল ফেলিয়া আসিলেন কেন? নরেন্দ্র মনে মনে বলিলেন, সেখান থেকে যে পালিয়ে এসেছি, এই আমার বাপের ভাগ্য।

ভূতল হইতে উঠিয়া ও ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া নীহার পাড়ায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হওয়া দূরে থাক্ পাড়ার সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আহারের নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুই দিল না, বরং দূর্ দূর্ করিয়া তাড়াইতে লাগিল। নীহারকে অসহায়া দেখিয়া পাড়ার বালকেরা এই সুযোগে তাঁহার গাত্রে নুড়ী ও ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে পাড়া পার করিয়া দিল। এত ক্ষণ এ সংবাদ পাড়ার বালকদের শিরোমণি মহাশয়ের কর্ণে উঠে নাই। তিনি বাটীতে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। এই সময়ে এক জন সঙ্গী তাঁহাকে গাত্রে ঠেলা মারিয়া তুলিল। তিনি উঠিয়া চক্ষু ঘষিতে ঘষিতে সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজি আমাদের পাড়াতে হনুমান্ আসিয়াছে কি?

সঙ্গী। না।

শি। পাড়ার কুকুরে কোন বিদেশী কুকুরকে খেদাইয়াছে কি?

সঙ্গী। না।

শি। অন্য পাড়ার বালকেরা আমাদের কাহাকে মারিয়াছে কি?

সঙ্গী। না।

শি। কাহার বিড়ালকে বা কুকুরকে মারা হইয়াছে বলিয়া কেহ আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছে কি?

সঙ্গী। ও সব কিছুই নয়। যে মাগী অনীল বাবুর সহিত বেরিয়ে গিয়েছিল, আজি সেই নীহার এখানে আসিয়াছে। এক দিন আমরা বিড়াল মারিতেছিলাম বলিয়া মাগী আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছিল। সে এখন কাণী হইয়াছে, পাড়ার লোকেরা তাহাকে মারিতে হুকুম দিয়াছে। ইহা শুনিয়া শিরোমণি কর-তালি দিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া শীকারী কুকুরকে ডাকিয়া লইয়া ঘটনাস্থলে পঁহুছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে তদীয় অনুচর-গণ করতালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। শিরোমণি দেবেন্দ্র প্রভৃ-তিকে খেজুরকাঁটা এবং মহীন্দ্র, সুরেশ, যোগেশ প্রভৃতি শত শত দুষ্ট বালককে লুড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। সকলে শশব্যস্ত হইয়া হুকুমমত কার্য্য করিল। শিরোমণি এক ব্যূহ রচনা করিয়া দিলেন। তৎপরে কেহ কেহ নীহারের গাত্রে খেজুরকাঁটা ফুটাইতে এবং কেহ কেহ লুড়ী মারিতে লাগিল। শিরোমণির দুরন্ত কুকুর প্রভুর সঙ্কেতানুসারে নীহারের গাত্রে ভয়ানকরূপ দংশন করিতে লাগিল। নীহার ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তৎপরে শিরোমণি তাঁহাকে বাঁধিতে হুকুম দিলে সকলে আজ্ঞানুসারে বন্ধন করিয়া পশ্চিম দিকে লইয়া চলিল এবং অপরাহ্ণে এক বনের প্রসিদ্ধ গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ কবিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল। ঐ সময় শীতকাল। কূপে হস্তপরিমিত জল ছিল। কিঞ্চিৎ জল খাইয়া নীহার সংজ্ঞা পাইয়া যন্ত্রণা অনুভব করিতে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দারুণ শীতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার হাত পা বদ্ধ থাকাতে শীত নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তিনি কাতরবাক্যে বলিলেন, স্বামিন্! আমি আর তোমাকে ডাকিতে পাইব না। স্বামিন্! আমার কথা যে আর তোমার কর্ণে পঁহুছিবে, আমার এমন আশা নাই। তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি শুনিতে এবং অভাগিনীর হৃদয়বেদনা জানিতে

পারিতেছ না। ইহা বলিয়া নীহার নিস্তব্ধ হইয়া নির্ব্বাকে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, আমি মরিলে আমার জন্য কেহ কি কাঁদিবে? না, কেহ কাঁদিবে না। ইহা বলিয়া তিনি নির্ব্বাক্ হইলেন এবং ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আবার বলিলেন, আমার এই মৃত্যুকালে আমি যদি তাঁহাকে আমার এই হৃদয় দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি মরিলেও তাঁহার কাছে আমার আশা থাকিত। হায়! এই সংসারে আমার কিছুই রহিল না ভাবিয়া প্রাণ যে কেমন করিতেছে। আমি যখন মানবের সহিত আমার হৃদয় মিশাই নাই, তখন আমার ন্যায় পাপিনী ও নির্ব্বোধ পৃথিবীতে আর নাই। এখন আমার বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারিত করিবার কাল। হায়! আমি সংসারে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি, সে সমস্ত মিথ্যা, কেবল বাল্যকালে প্রিয়তমের সহিত যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য, কিন্তু তাহা পাপে বিনষ্ট করিয়াছে। ক্রমাগত কয়েক দিন এইরূপ হতাশ চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি অবশেষে অনাহারে কালকবলে নিপতিত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

——000——

প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অমীল সংপূর্ণরূপ সুস্থ হইলে এক দিন অপরাহ্নে বন্ধু ভোলানাথের সহিত বেড়াইতে যাইয়া একটী গিরির উপত্যকা ভাগে উঠিলেন এবং কিছু কাল প্রকৃতির শোভা দেখিয়া

ভোলানাথকে বলিলেন, ভোলানাথ! আমি নরকে ভুগিয়া যে কয়েকটী জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা যদি তোমার মত সকল যুবক হৃদয়ে রাখে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমার মত যন্ত্রণা পাইতে হইবে না। ইহা শুনিয়া ভোলানাথ বলিল, ভাই অনীল! তোমার জ্ঞান সংসারবিরাগী যোগীদের অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, কারণ তুমি প্রবঞ্চিত হইয়া শিখিয়াছ। তুমি কি বলিবে বল, আমি শুনিতেছি। অনীল বলিলেন, জড় হইতে উৎপন্ন শরীরের শ্রেষ্ঠ ভাগকে আত্মা বলে। যাহা আত্মা তাহাই প্রেম, যাহা প্রেম তাহাই শান্তি এবং যাহা শান্তি তাহাই সুখ। আত্মার স্থান মস্তক। যাহা দেখিতে পাইবে না, তাহা করিও না এবং কামের উৎপীড়নে মস্তক হইতে নামিয়া লিঙ্গের মধ্যে যাইয়া প্রত্যক্ষ নরককুণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণাংশ বীর্য্য নষ্ট করিও না। যাঁহার শরীর তাঁহাকে ভিন্ন অন্যকে শরীরে স্থান দিও না। শরীর এক মাত্র প্রেমের। কাম হইতে পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহা প্রেমের কার্য্য। যদি কাম সকলের মনে সদা প্রবল থাকিত, তাহা হইলে এত দিন সংসার লয়প্রাপ্ত হইত, মাতা যৌবনধ্বংসকারী পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত কিংবা কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া গর্ভ নষ্ট করিত অথবা গর্ভ রতিকার্য্যের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া ঔষধাদি ভক্ষণ করিয়া এককালে তাহার উৎপাদনশক্তি নষ্ট করিত এবং সকলে কামোন্মত্ত হইয়া পরস্পরের জন্য পরস্পর বিবাদ করিয়া মরিত। তুমি মরিলে পুত্র জন্মিয়া তোমার স্থান পূরণ করিবে বলিয়া কামকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও, কিন্তু বহু সন্ততির পিতা হইও না। মূর্খ পুত্র হওয়া অপেক্ষা তাহা না হওয়া ভাল। সুখদুঃখজ্ঞানশূন্য জড় হইতে সুখ দুঃখের অনুভব-শক্তি-শালী নব জীব উৎপাদিত করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া কেবল কামের কার্য্য, কিন্তু প্রেম কামের এই অভিসন্ধি নষ্ট করে। অজ্ঞানের ও অজ্ঞানোদ্ভূত

প্রবৃত্তিদের কল্পনা ও কার্য্য সমস্তই মিথ্যা, কেবল তাহারা আত্মাকে যে কষ্ট দেয় তাহাই একমাত্র সত্য। দুষ্ট প্রবৃত্তিরা কারণ দেখিয়া কার্য্য করে না।

তৎপরে সন্ধ্যা হইল। তাঁহারা দুই জন অন্ধকারে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথের প্রান্তভাগে ঝাঁটীবনের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। স্বামিন্! কোথায় যাইলে? আপনি যখন সংসার ছাড়িয়াছেন, তখন আমার ইহাতে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, তবে সংসারে থাকিব কেন? আমার কি আর সংসারে প্রয়োজন নাই? আছে, আমার কি আর সংসারে বন্ধু নাই? কোটী কোটী আছে, তবে সংসার ছাড়িতে চাই কেন? নীহারের দুর্দ্দশা ভাবিয়া। আমার পিতার যে অতুল সম্পত্তি আছে তাহা অতিথিশালার জন্য লিখিয়া দিলে আমার সংসারে থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই সময়ে লজ্জাবতি! লজ্জাবতি! বলিয়া অনীল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইহা শুনিয়া ও অনীলকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জাবতী স্তম্ভিতা হইলেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন। তৎপরে লজ্জাবতী অনীলকে খুঁজিতে আসিয়া যে অমঙ্গল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার অদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং বিষয় পত্র দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। তাহার পর দিন তাঁহারা সকলে জেলা ছাড়িয়া লজ্জাবতীর গৃহে পঁহুছিলেন। অনীল লজ্জাবতীকে বিবাহ করিলেন এবং শশুরের সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যে অনেকের সহিত সদ্ভাব করিয়াছিলেন, সেই জন্য নানা বিপদে পড়িয়াও অবশেষে আত্মরক্ষা করিতে, প্রবল শত্রুগণকে শাস্তি দিতে এবং আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া যে অমূল্য জ্ঞানরাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদনুসারে সংসারে চলিতে, সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুত্ব করিতে, দীন দরিদ্র লোক-দিগকে প্রার্থনাধিক দান করিতে এবং অজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রসূন দরিদ্রসন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত ছিল। তিনি কখন লোভের বশীভূত হয়েন নাই। অনীল তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া কেবল তদীয় অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অভিলাষী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন বলিয়া প্রসূন অনীলের দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হইয়া অনীলের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মনে প্রভুভৃত্যভাব ছিল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—000—

উপসংহার।

নীলিমা উপরিতলস্থ স্বীয় কক্ষে শয়ানা। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইলেও তদীয় মন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে মণী বসিয়া আছেন। মণী নীলাম্বরবসনা। তদীয় ওষ্ঠদ্বয় তাম্বূলরাগে রঞ্জিত। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু চঞ্চল হওয়াতে বোধ হয় যেন তাহার উপরি চপলা নাচিতেছে। তিনি নীলিমার বিষাদপূর্ণ চক্ষুর দিকে চাইয়া বলিলেন, নীলি!

যাহাতে আপনার প্রাণ যায়, তুই এমন ভালবাসা কার কাছে শিখেছিস্ ?

নীলিমা। সে যাক্, তোর পায়ে ধরি, আমাকে একটা লোক করে দেনা দিদি! আমি তার সঙ্গে দাদার বাড়ী যাই। আমি অনেক দিন, তাঁহাকে দেখি নাই। আমার মন কেমন কেমন করিতেছে। না, আমার সেখানে যাওয়া হবে না, পথে অনেক বিপদ্ আছে। মণী দিদি! পথে তোমার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার সঙ্গে পাল্কী, দরওয়ান আর চাকর দিতেছি, তুমি দাদার কাছে যাও এবং তাঁহাকে বল, নীলিমার বড় অসুখ হোয়েছে। আমার অসুখ শুন্লে দাদা কখন স্থির হোয়ে থাক্তে পার্বেন না। তুমি দাদাকে আপনার পাল্কীতে তুলে নিয়ে আসিবে। যদি দাদার কোন অসুখ হোয়ে থাকে, তাহা হইলে তুমি দাদার কাছে থেকে সত্বর আমাকে একখানি পত্র লিখিবে। তোমার পায়ে ধরি, তুমি শীঘ্র যাও।

মণী নীলিমার বাক্যে গলিত হইয়াও, দুঃখ ঢাকিয়া বলিলেন, আমি যদি তোর দূতী হোই, তবে পুরস্কার পাব কত ?

নীলিমা। আমার যত গহনা আছে, সে সকল তোমাকে দিব। তুমি যদি ইহা বিশ্বাস না কর, তবে তাহা আগে লও।

মণী। আমার গহনায় কায নেই। তুই যদি তোর দাদাকে আমার তামাক সাজিবার লোক কোরে দিতে পারিস্, তা হোলে আমি তথায় যাই।

নীলিমা। দাদাকে তুমি এত বড় কথা বোল না। তোমার যখন দরকার হবে, তখন আমি তোমাকে তামাক সেজে দিব।

মণী। আগে এক ছিলিম দে দেখি, পরক করা যাক্।

নীলিমা শশব্যস্ত হইয়া আলবোলায় এক ছিলিম তামাক

সাজিয়া মণীকে আনিয়া দিলেন। মণী শয্যায় আলবোলা রাখিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। যে ভঙ্গিতে মণীর তাম্রকূট সেবন হইতেছিল, তাহা ভাবুক ব্যক্তির মনোহারী এবং কামুকের কামোদ্দীপক। এই সময়ে একজন যুবক আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান। মণী শশব্যস্ত হইয়া আলবোলাটী পর্য্যঙ্কপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন এবং নীলিমার চিন্তা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখ্ দেখ্ নীলিমা! চেয়ে দেখ্। তুই এত ক্ষণ যাহাকে যোগে দেখিতেছিলি, এ কি সেই? তৎপরে যুবক আস্তে আস্তে শয্যায় বসিলেন। নীলিমা তাঁহাকে দেখিয়া মণীর দিকে চাইয়া বলিলেন, দিদি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? এবং মনে মনে ভাবিলেন, মণী দিদীও কি তবে মিথ্যা? হাঁ, এক বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে তাহা দেখা যায়। যুবক নীলিমাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে চাপিয়া ধরিলেন। নীলিমা বলিলেন, দাদা! দাদা! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এবং মনে মনে ভাবিলেন, এমন কত বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কৈ এক বার তো সত্য হয় নাই? তৎপরে তিনি করতল দিয়া চক্ষু ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এক এক বার সলীলকে দেখিতে লাগিলেন। সলীল বলিলেন, নীলিমা! তুমি এমন করিতেছে কেন? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? ইহা শুনিয়া নীলিমা ভাবিলেন, দাদা! স্বপ্নে এমন কতই বল, কৈ এক দিনও তো সত্য এস না? তৎপরে তিনি সলীলের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাইয়া রহিলেন, কত বার কাঁদিলেন এবং সলীলের সহিত কত আলাপ করিলেন, তথাপি তাঁহার স্বপ্নভ্রম দূর হইল না।

অনেক ক্ষণ পরে নীলিমা জানিতে পারিলেন, ইহা স্বপ্ন নহে, তাঁহার দাদা যথার্থই তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি ব্যগ্রচিত্তে সলীলের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয়

দুঃখের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার দোষারোপ করিলেন না। সলীল নীলিমার সরল ভাব ও অকৃত্রিম প্রণয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ সরল ও সদ্গুণসম্পন্ন, কিন্তু কুসংসর্গে পড়িলে তাহারা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া উঠে। সংসর্গ-দোষ না ঘটাতে নীলিমার এত বয়ঃক্রমেও মন বিকৃত হয় নাই। মণীও সলীলের ন্যায় চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই চিন্তার বিষয় একরূপ।

সম্পূর্ণ।